উপন্যাস
একটি নারীর পুনর্জন্ম
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
SHARP
Esquire Electronics Ltd
অলংকরণ :: চন্দ্রশেখর দে

এই স্টেশনে কখনো এত ভিড় থাকে না। ছোট, নিরিবিলি স্টেশন, কোনোরকম কল-কারখানা কিংবা বাণিজ্যের কেন্দ্রও নয়। শীতকালে বাইরে থেকে কিছু মানুষ হাওয়া বদল করতে আসে, অনেক সপ্তাহ থেকে যায়, কিন্তু এখনো তো শীত পড়ে নি, সেরকম কোনো লম্বা ছুটিরও সময় নয়।

তবু ট্রেন আসার পর জানালা দিয়েই অতনু দেখতে পেল, প্ল্যাটফর্ম একেবারে লোকে লোকারন্য। তারা কিন্তু হুড়োহুড়ি করে কামরায় উঠছে না, সবাই উৎসুকভাবে ট্রেনের দিকে চেয়ে আছে। প্রতীক্ষা করছে কারুর জন্য।

ওপর থেকে ব্যাগটা নামিয়ে নিয়ে অতনু দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। রবি নিশ্চয়ই নিতে আসবে। সবকিছু ব্যবস্থা করে রাখার জন্যই তো আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে রবিকে।

ভিড়ের মধ্যে রবিকে খুঁজতে খুঁজতে, সে রবিকে দেখতে পেল না। কিন্তু হঠাৎ যেন তার দিব্যদর্শন হলো।

দরজার কাছে না দাঁড়িয়ে অতনু যদি নেমে পড়ত প্ল্যাটফর্মে, তা হলে তার এ দৃশ্য দেখার সুযোগ হতো না। ওপর থেকে এক সঙ্গে অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

খুব দূরে নয়, আর দু'তিনটে কামরার পরে, দরজার কাছে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চৌদ্দ-পনেরোজন নানা বয়েসের নারী। তারা সবাই লাল পাড়— সাদা শাড়ি পরা, মৃদু স্বরে কিছু একটা গান গাইছে, তাল দিচ্ছে হাত-চাপুড়ি দিয়ে, কারুর কারুর শরীরও দুলছে নাচের ভঙ্গিতে। মনে হয়, এরা কোনো আশ্রম-টাশ্রম থেকে এসেছে। এদের মধ্যে একজনের দিকে অতনুর দৃষ্টি আটকে গেল। ধক করে উঠল বুক। মানুষ এত সুন্দর হয়? মফঃস্বল শহরের আশ্রমে এ যেন এক স্বর্গচ্যুত দেবদূতী। শ্বেত ও রক্ত চন্দন মেলানো গায়ের রঙ, টানা টানা চোখ, গভীর ভুরু, আবেশ মাখা মুখ, পাতলা ঠোঁটের গড়ন দেখলেই বোঝা যায়, বেশ শিক্ষা-দীক্ষা আছে। মানুষের শিক্ষার ছাপ বেশি করে পড়ে ঠোঁটে।

নামতে ভুলে গেল অতনু, তাকিয়েই রইল।

পরপর দুটি চিন্তা এলো তার মনে।

এমন একটি রূপসী তরুণী আশ্রমে যোগ দিয়েছে কেন?

তারপরই সে ভাবল, এ মেয়ের সঙ্গে কি পরিচয় করা সম্ভব? অন্তত একবার কথা বলতে না পারলে তার জীবনটাই যেন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এই সময় আরো অনেকে মিলে যেন একটা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

ভিড় ঠেলে ঠুলে রবি কাছে এসে বলল, কী রে, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ব্যাগটা দে।

ঘোর ভেঙে গেল অতনুর। প্ল্যাটফর্মে নেমেই সে একটা সিগারেট ধরালো। আজকাল ট্রেনেও ধূমপান নিষেধ, গলা শুকিয়ে এসেছিল।

এত ভিড় কেন রে, রবি?

রবি বলল, সিগারেটের প্যাকেটটা পকেটে ভরলি কেন? দে...। কী যেন একটা আশ্রম হয়েছে এখানে। এই ট্রেনে তাদের গুরু আসবে। সব সাইকেল, রিকশা, টাঙ্গা বুক্‌ড। তোকে কিন্তু হেঁটে যেতে হবে। অবশ্য মালপত্র তো বেশি নেই।

অতনু দাঁড়িয়েই রইল। এখান থেকে তরুণীটিকে ভালো দেখা যাচ্ছে না, লোকের আড়াল পড়ে গেছে, তবু তার দৃষ্টি উৎসুক।

এবারে একটি কামরা থেকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে যাঁকে নামানো হলো, সবাই আবার জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল, তিনি পুরুষ নন, একজন প্রৌঢ়া মহিলা। গুরু নন, গুরু মা!

আজকাল মাঝে মাঝেই এরকম গুরুমাদের কথা শোনা যায়। এটা নারী-শক্তির একপ্রকার জয় বলতে হবে। পুরুষদের বদলে মহিলারা বসছে গুরুর আসনে।

অতনু বলল, রবি, ঐ গুরুমার ডান পারে মেয়েটিকে দ্যাখ। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। আগেই দেখেছি। কী সাঙ্ঘাতিক রূপ রে! আগুন! কাছে গেলেই যেন হাত পুড়ে যাবে।

ওদের আশ্রমটা কোথায় রে? দেখতে যাওয়া যায় না?

অমনি বুঝি মনে কু-চিন্তা জেগেছে? সাবধান, বন্ধু। ঐ আশ্রম খুব বড়লোকদের ব্যাপার।

তা বলে দেখতে যাওয়া যায় না বুঝি? আমি ঐ গুরুমা সম্পর্কেও ইন্টারেস্টেড, কথা বলে দেখতে চাই, কীভাবে একজন মহিলা এতগুলো লোকের মাথা নুইয়ে দিতে পারেন! নিশ্চয়ই কিছু ম্যাজিক আছে। হিপনোটিজম?

ম্যান হিপনোটিজম বলে কিছু হয় না। ওটা গাঁজাখুরি ব্যাপার। ম্যাজিশিয়ান পি সি সরকার সম্পর্কে একটা গল্প আছে। একদিন তাঁর ম্যাজিক শো শুরু হবার কথা ছ'টায়, হলভর্তি, হাউজফুল, উনি এসে পৌঁছোন নি। যখন পৌঁছোলেন, তখন সাড়ে ছটা। স্টেজে এসেই উনি বললেন, আমি কি দেরি করে ফেলেছি? আমার ঘড়িতে তো দেখছি, ছটা বাজতে তিনি মিনিট বাকি। আপনাদের ঘড়িতে কটা বাজে দেখুন তো! সব দর্শকরা দেখল, তাদের ঘড়িতেও ছটা বাজতে তিন মিনিট বাকি। শুনেছিস গল্পটা? ঐ ব্যাপারটা কিন্তু কোনোদিনই ঘটে নি। পি সি সরকারের পাবলিসিটি ম্যানেজার ঐ গল্পটা রটিয়েছিল। অনেক লোক বিশ্বাসও করে। পৃথিবীর কোনো ম্যাজিশিয়ানেরই সাধ্য নেই, একসঙ্গে বহু লোককে হিপনোটাইজ করার।

অতনু ভুরু কুঁচকে বলল, তাহলে এইসব গুরুরা এত লোককে বশীভূত করে কী করে?

রবি হেসে বলল, মার্কস না লেনিন কে যেন বলেছিলেন, ধর্ম হচ্ছে জনগণের আফিম। এইসব লোকেরা নিশ্চয়ই আফিম গোলা জল খায়।

ঐ মেয়েটির কত বয়েস হবে? বড়জোর তিরিশ, অমন রূপ, ও কেন লাল পাড় শাড়ি পরে আশ্রম-বালিকা হবে? ও তো অনায়াসে সিনেমা-স্টার হতে পারত, অথবা, মানে, অনেক কিছু। ওর পক্ষে ধর্মকে আঁকড়ে ধরা কি স্বাভাবিক?

গুরুমাকে নিয়ে সবাই বেরিয়ে গেছে। এখন প্ল্যাটফর্ম খালি। ওরা বাইরে এসে দাঁড়ালো, সত্যিই একটাও রিকশা বা টাঙ্গা বা গাড়ি-টাড়ি কিছু নেই। রবি অতনুর ব্যাগটা নিয়েছে, ব্যাগটা বেশ ভারি, ভেতরে কয়েকটা বোতল আছে।

অতনু বলল, ব্যাগটা আমায় দে।

রবির একটা পা বেশ খোঁড়া। ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে হয়, তবে সে দুটোর বদলে একটা ক্রাচ নেয়। সে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে ফেলেছে, দিল না।

এখন পরিপক্ক বিকেল, সন্ধে হতে কিছুটা দেরি আছে। এই সময়কার আলো বেশ নরম; স্টেশনের পেছনেই পটভূমিকায় একটা পাহাড়। এদিককার সব পাহাড়ের ওপরেই একটা করে মন্দির।

অতনু এই দ্বিতীয়বার এলো মহুল ডেরায়। একটা প্রধান পিচের রাস্তা ছাড়া আর সব রাস্তার লাল রঙের। কোনো বাড়িই ঘেঁষাঘেঁষি নয়, কোথাও এমনিই ফাঁকা জমি পড়ে আছে। কোথাও একসঙ্গে বেশ কয়েকটা লম্বা শাল গাছ। শহর থেকে এসে এসব রাস্তায় হাঁটলে চোখের আরাম হয়।

অতনু জিজ্ঞেস করল, গেস্ট হাউজটা ক'দিনের জন্য বুক করেছিস?

রবি বলল, গেস্ট হাউজ নয়, ওসমান সাহেব নিজের বাড়িতেই ব্যবস্থা করেছেন। এররকম জোর করেই।

অতনু ভুরু কুঁচকে বসল, বাড়ির মধ্যে? কোনো অচেনা পরিবারে আমি থাকা পছন্দ করি না।

বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যে, কিন্তু ফ্যামিলির সঙ্গে নয়। কম্পাউন্ডের মধ্যে কয়েকটা আলাদা কটেজ আছে। সব ব্যবস্থা আলাদা।

ওখানে ড্রিংক করা যায়? অনেক সময় বাড়ির লোক পছন্দ করে না।

ওসমান সাহেব নিজেই রোজ ড্রিংক করেন। কাল তো উনিই আমাকে খাওয়ালেন।

আর রান্না-বান্না?

একজন লোক আছে। আমার জন্য অবশ্য কাল রাতে বাড়ির ভেতর থেকেই বিরিয়ানি এসেছিল। তোকে বলছি অতনু, এত চমৎকার স্বাদের বিরিয়ানি আমি জীবনে খাই নি।

তুই তো খেয়ে নিয়েছিস। রোজ নিশ্চয়ই বিরিয়ানি রান্না হবে না। আমার ভাগ্যে জুটবে না।

বলে দেখতে পারি।

না, কিছু বলাবলির দরকার নেই। আমাদের বাড়িটার কী অবস্থা?

এখনো রিপেয়ারিং-এর কাজ চলছে। থাকার মতোন হয় নি। আমি অবশ্য বলেছি, একটা ঘর আর বাথরুম অন্তত আগে তৈরি করে দিতে হবে। আমরা এক রাত্তির ওখানে থাকব। একটা কী ব্যাপার জানিস, স্থানীয় লোকজনদের ধারণা, ওটা নাকি ভূতের বাড়ি। মিস্ত্রিরিরাও কী সব শব্দ টব্দ শোনে, ভয় পায়। সন্ধের পর কেউ থাকতে চায় না।

অতনু হেসে বলল, এরকম গুজব থাকা ভালো। বাইরের লোক কাছে ঘেঁষবে না। ঐ জন্যই বাড়িটা কিছুটা শস্তায় পেয়েছি।

মিনিট দশেক হাঁটার পর একটা জিপ গাড়ি উল্টো দিক থেকে এসে ওদের কাছে ব্রেক কষে দাঁড়াল।

ড্রাইভারের আসন থেকে মুখ বাড়ালেন, একজন হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি, দাড়ি নেই, শুধু গোঁফ আছে, জুলপি দুটোও নিচে নেমে এসেছে অনেকখানি, গোঁফের প্রান্ত ছুঁয়েছে।

তিনি বললেন, আরে ছিছি, আপনাদের হেঁটে আসতে হলো! আমাকে বললেই আমি গাড়ি নিয়ে স্টেশনে যেতাম।

অতনু বলল, হাঁটতে ভালোই লাগছে। কোলকাতায় তো বিশেষ হাঁটা হয় না। কেমন আছেন, ওসমান সাহেব? খবর সব ভালো তো?

ওসমান বললেন, জি, সব ভালো, উঠুন, গাড়িতে উঠে পড়ুন। রবি বাবুর হাঁটতে কষ্ট হয়।

রবি বলল, তা একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু একেবারে না হাঁটলে যে অথর্ব হয়ে যাব। তাই অভ্যেস রাখতে হয়।

জিপে ওঠার পর ওসমান জিজ্ঞেস করলেন, ট্রেন ঠিক সময়ে এসেছে?

অতনু বলল, দশ মিনিট লেট, এমন কিছু না।

ওসমান বললেন, দশ মিনিট আমরা ধরিই না। গতকাল ছিল আড়াই ঘণ্টা লেট।

এইসব ছোট জায়গায় কুশল সংবাদের চেয়েও জরুরি, ট্রেন বিষয়ে আলোচনা। ট্রেন নির্ভর জীবন। ট্রেনে খবরের কাগজ আসে, বাইরের মানুষ আসে।

অতনু জিজ্ঞেস করল, আজকের ট্রেনে কে একজন গুরু-মা এলেন। আমি আগে যেবার এসেছিলাম, আমি তো এখানে কোনো আশ্রমের কথা শুনি নি।

ওসমান বললেন, আগে ছিল একটা ছোটখাটো। ছ'মাস আগে সেটাকে খুব বড় করা হয়েছে। কী একটা বেদান্ত সঙ্ঘ, একটা চেইনের মতোন, আরো অনেক জায়গায় লোক আছে। অনেক টাকাওয়ালা লোক আছে এর মধ্যে মনে হয়। বিউটিফুল বাড়িটা বানিয়েছে। দেখবার মতোন।

অতনু বলল, একবার দেখতে যেতে হবে।

রবি আপন মনে অনুচ্চ গলায় হেসে উঠল।

ওসমান বললেন, অবশ্যই যাবেন। আমিও দেখে এসেছি। তবে একটা ব্যাপার ঠিক বুঝলাম না। বেদ তো আপনাদের ধর্মগ্রন্থ। কিন্তু বেদান্ত কী?

অতনু বলল, সেটা আমিও জানি না ঠিক, তবে রবি নিশ্চয়ই জানে, ও অনেক পড়াশুনো করে। কিন্তু ওকে জিজ্ঞেস করলেই ও একটা লম্বা লেকচার দেবে। আপনি বরং পরে শুনে নেবেন।

রবি বলল, না, আমি লেকচার দেবো না। শুধু এই কথাটা বলতে পারি, মিস্টার অতনু মজুমদার এর আগে কখনো মন্দির কিংবা আশ্রম দেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে নি! এমনিতে উনি ঘোর নাস্তিক!

অতনু বলল, নাস্তিক হলেও মন্দির-টন্দিরের যদি সুন্দর স্ট্রাকচার হয়, ঐতিহাসিক মূল্য থাকে, তাহলে আগ্রহ থাকবে না কেন? কোনারক মন্দিরে গেছি, দিল্লির জামে মসজিদে, সে বিশাল ব্যাপার, দশ হাজার লোক একসঙ্গে নামাজ পড়তে পারে, সেটা একটা দেখার মতোন ব্যাপার নয়? আর একবার মনে পড়ে, টুয়েন্টি ফোর্থ ডিসেম্বর রাত বারোটার সময় সেন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রালে গিয়েছিলাম, অর্গান বাজিয়ে কী অপূর্ব গান হচ্ছিল, এসব আমার ভালো লাগে।

ওসমান বললেন, এই আশ্রমেও প্রত্যেক সন্ধেবেলা গান হয়। আর একটা ভালো ব্যাপার কী জানেন, এখানে তো হাসপাতাল ছিল না, চিকিৎসার জন্য যেতে হতো আসানশোলে, এই আশ্রমের সঙ্গে একটা হাসপাতাল হয়েছে, ছোট হলেও খুব মডার্ন, হিন্দু-মুসলমান কোনো বাছ-বিচার করে না। আমার ছেলের কিডনিতে স্টোন হয়েছিল, ওনারাই তো সারিয়ে দিলেন, অপারেশনও করতে হলো না।

ওসমান সাহেব, রবির কাছে শুনলাম, আপনার বাড়িতেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন। সে জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের কেনা বাড়িতেও আমরা দু'এক রাত কাটিয়ে যেতে চাই। সেরকম তৈরি করা যাবে তো?

আর দু'দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে। পাম্পে পানি উঠছে। আলো এসে গেছে। শুধু বাথরুমের কাজ কিছুটা বাকি আছে।

আলো এসে গেছে মানে? আগে তো ইলেকট্রিসিটি ছিল না।

এই তো ছ'মাস আগে কানেকশন পেয়েছি, সে-ও ঐ বেদান্ত আশ্রমের জন্য। অনেক মন্ত্রী-টন্ত্রি আসে, আগে কত দরবার করেও আমরা বিদ্যুৎ পাই নি। আশ্রমের জন্য সাধারণ মানুষেরও অনেক উপকার হয়েছে, থানাটাকেও বড় করা হয়েছে। এদিকে মাওবাদীদের উপদ্রব শুরু হয়েছে জানেন তো, জঙ্গলের মধ্যে তাদের ডেরা, প্রায়ই খুন-টুন হয়, অবশ্য, এই দিকে তারা এখনো আসে নি, গ্রামে গ্রামেই ওরা প্রচার করে।

ওদের তো ঝগড়া রাজনৈতিক দলের সঙ্গে। আপনি কোনো রাজনৈতিক দলে আছেন নাকি?

আমি ব্যবসা করে খাই। কোনো দলেই নেই, আবার সব পলিটিশ্যান পার্টির সঙ্গেই ভালো সম্পর্ক রাখতে হয়। সব দলকেই চাঁদা দিই। এমনকি ঐ মাওবাদীদেরও চাঁদা দিয়েছি।

কত চাঁদা দিয়েছেন!

চেয়েছিল কুড়ি হাজার। রফা করেছি দু'হাজারে। দেখুন ঐ মাওবাদীদের একটা অনেস্টি আছে। চাঁদার রসিদ দেয়। আর একবার রফা হয়ে গেলে পরে আর হাঙ্গামা করে না। বলেই দিয়েছে আর এক বছরের মধ্যে কিছু চাইবে না।

আপনি ক্যাশ টাকা চেয়েছিলেন। আমি বাকি টাকা এবারে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আপনার বাড়ি পৌঁছেই সব টাকা আপনার কাছে জমা করে দেব। আমার কাছে এত টাকা রাখতে চাই না।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, রেজিস্ট্রেশনের সব কাগজপত্রও তৈরি। এই শীতকাল থেকেই আপনারা লোক পাঠাতে পারবেন। একজন কেয়ারটেকার রাখতে হবে। সে জন্য একজন লোকও দেখে রেখেছি।

রবি বলল, আমাকে কেয়ারটেকার রাখলে কেমন হয়? আমি এখানেই থেকে যাব ভাবছি!

অতনু বলল, তুই একে খোঁড়া, তার ওপর ইনটেলেকচুয়াল, তুই কেয়ারটেকার হবার একেবারেই অনুপযুক্ত।

খোঁড়াকে খোঁড়া বলিতে নাই, তা জানিস না?

নিজের বন্ধুকে সব কিছু বলা যায় রে শালা!

ওসমান সাহেবের বাড়ির গেটের দু'দিকে দুটো বাতি জ্বলছে। বাড়ির সব কটা ঘরে আলো জ্বলা। নতুন ইলেকট্রিসিটি এসেছে বলেই যেন এই আলোর উৎসব।

দুই

রাত্তিরটা আড্ডা ও পানাহারে বেশ ভালোই কাটল।

বাইরে এলে সবাই সাধারণত কিছুটা দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। স্বাস্থ্য-বায়ুগ্রস্তরা ভোরে উঠে হাঁটতে বেরোয় কিংবা জগিং করে, অতনুর ওসব বাতিক নেই।

তবু তার ঘুম ভেঙে গেল বেশ সকালেই। কিছুক্ষণ বিছানায় গড়িমসি করে সে উঠেই বসল। আর ঘুমের আশা নেই।

পাশের খাটে অঘোরে ঘুমোচ্ছে রবি। গা থেকে চাদরটা সরে গেছে, পাজামা পরা, খালি পা। অতনু লক্ষ করল, বেশ রোগা হয়ে গেছে তার বন্ধুটা। গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে একটা পায়ের পাতা ছেঁচে যাবার পর থেকেই রবির চেহারা ও স্বভাবে অনেক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। কিন্তু পা খোঁড়া হবার সঙ্গে রোগা হওয়ার সম্পর্ক কী? আগে রবির প্রায় কথাতেই নানারকম রসিকতা থাকত, এখন এসেছে সূক্ষ্ম বিদ্রূপের ভাব। সব কিছুই সে বাঁকা চোখে দেখে। আগে তার অনেক মেয়ে বন্ধু-টন্ধু ছিল, একজনের সঙ্গে তো বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক, অ্যাকসিডেন্ট হবার পর সে নিজেই সেই মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিল, আর কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও করে না।

রবিকে একটা ধাক্কা দিয়ে অতনু বলল, এই, আর কতক্ষণ ঘুমোবি? আমরা বেড়াতে বেরুবো।

রবি উঠে বসে চোখ কচলালো। তারপর বলল, বেড়াতে? অর্থাৎ প্রথমেই সেই বেদান্ত সঙ্ঘের আশ্রমে। তাই না?

অতনু বলল, তার কোনো মানে নেই! এদিক ওদিক ঘুরে ভালো করে দেখতে হবে না জায়গাটা? আমাদের গেস্ট হাউজটার জন্য একটা পাবলিসিটি ফোল্ডার বানাতে হবে!

রবি জিজ্ঞেস করল, তোর সঙ্গে মেয়েটার একবারও চোখাচোখি হয়েছিল?

কোন মেয়েটা?

যার কথা বলছি, তুই ঠিকই বুঝেছিস? ঐ যে কালকের দেখা, মাথায় চুল চুড়ো করে বাঁধা, রূপের ছটায় ধাঁধানো মেয়েটা!

না, চোখাচোখি হয় নি। আমাকে সে দেখতেও পায় নি।

তবু তুই মদন বাণে বিদ্ধ হয়ে গেছিস, বোঝাই যাচ্ছে। রাত্তিরে ওকে স্বপ্ন দেখেছিলি?

যাহ, কাল অত নেশা করা হয়েছে, তার পরে আর স্বপ্ন দেখা যায়?

খানিকবাদে ওরা দু'জন তৈরি-টৈরি হয়ে বেরুবার উপক্রম করছে, ওসমান সাহেব এসে বললেন, একী, এত সকাল সকাল কোথায় চললেন? নাস্তা তৈরি হচ্ছে, খেয়ে যাবেন তো?

অতনু বলল, এইসব জায়গায় এলে রাস্তার ধারের দোকানে কচুরি আর জিলিপি কিনে তেলে ভাজা চপটপ খেতে আমার ভালো লাগে। বাড়ির নাস্তা তো রোজই খাই।

রবি জিজ্ঞেস করল, আপনার বাড়ির নাস্তায় নিশ্চয়ই কিছু মাংস থাকে?

ওসমান বললেন, হিন্দু বাড়িতে কিন্তু সকালে মাংস খাওয়া হয় না। বড় জোর ডিম। তাও কোলেস্টেরলের ভয়ে অনেকে ডিমও বাদ দেয়।

অতনু বলল, হিন্দুরা তো ভালো করে মাংস রান্না করতেই জানে না। মুসলমানরা আবার মাছটা তেমন ভালো পারে না। হিন্দুরা জানে না, মাংসে ঠিক কীভাবে মসলা মেশাতে হয়, আর মুসলমানরা জানে না মাছ ভাজার আর্ট।

ওসমান সাহেব বললেন, দুপুরে তাড়াতাড়ি ফিরুন, আজ চিতল মাছের পেটি খাওয়াব। দেখবেন, আমার স্ত্রী কেমন মাছ রান্না করেন। কচুরি-জিলিপি যদি খেতে চান, তাহলে ইস্কুল-মোড়ে চলে যান। ওখানে একটা দোকানে ওসব ভালো পাওয়া যায়।

রাস্তায় এসে ওরা একটা সাইকেল কিংবা রিকশা থামালো।

উঠে বসার পর অতনু কিছু বলার আগেই রবি বলল, বেদান্ত আশ্রমে আমাদের নিয়ে চলো তো ভাই যেটা নতুন হয়েছে।

অতনু বলল, আগে জিলিপি টিলিপি খাবো না?

খাওয়ার চিন্তা আর কামের চিন্তা, এর মধ্যে কোনটা বেশি জোরালো?

যাহ্, তুই কীসব কাম টামের কথা বলছিস? আমি মোটেই সেরকম কিছু ভাবি নি। মেয়েটিকে আর একবার দেখার ইচ্ছে হয়েছে ঠিকই।

দেখার ইচ্ছেটাও এক ধরনের কাম তো বটেই। হিন্দিতে সব কাজকেই বলে কাম। বাঙালরাও বলে। ঠিকই বলে। সব কাজের মূলেই তো কাম। দেরি করে গেলে আশ্রমে ভিড় হয়ে যাবে। সকাল সকাল যাওয়াই ভালো। খাওয়া-টাওয়া পরে হবে।

একটুখানি যাবার পর অতনু বলল, কাল রাত্তিরে ওসমান সাহেব কত কী ব্যবস্থা করেছিলেন। তিন চার রকমের কাবাব, আমি বোতল এনেছি, তবু নিজের ড্রিংকস খাওয়ালেন জোর করে। বাড়িটা কেনার সময় কী দরাদরিই না করতে হয়েছে। এখন আমাদের জন্য দু'হাতে পয়সা খরচ করছেন। নিজের গাড়িতে জঙ্গলে বেড়াতে নিয়ে যাবেন বললেন।

ব্যবসা আর আতিথেয়তা, দুটো আলাদা ব্যাপার। আতিথেয়তায় এঁরা সবসময় ওয়ান আপ।

আমরা বাড়িটা শেষপর্যন্ত যে দামে পেয়েছি, তা সস্তাই বলতে হবে। তুই অন্য দু'একটা বাড়ি দরদাম করে দেখেছিস এর মধ্যে?

হ্যাঁ। এটা ডেফিনিটলি সস্তা। তার একটা কারণ ঐ ভূতের বাড়ির বদনাম। এক বছর ও বাড়ি ভাড়াই হয় নি। দ্বিতীয় কারণ, উনি একটা ফলের বাগান কিনবেন, তার জন্য ক্যাশ দরকার। এখন ফল চাষ খুব লাভজনক। আসানসোলে একটা ফুড প্রসেসিং সেন্টার হচ্ছে।

আমরা ভূতের বাড়ির গুজবটা চেপে না গিয়ে বরং পাবলিসিটি দেব। কোলকাতার অনেক লোক ভূত দেখার জন্যই আসবে। এমনকি দু'একটা গ্যাজেট লাগিয়ে অলৌকিক শব্দ টব্দের ব্যবস্থা করলেও মন্দ হয় না।

এখানে বাড়ি কিনে গেস্ট হাউজ বানাবার আইডিয়াটা তোর না চন্দনার?

চন্দনারই বলতে পারিস। গত বছর বেড়াতে এসেছিলাম, কেউ একজন সাজেস্ট করেছিল, জায়গাটা চন্দনার খুব পছন্দ হয়ে গেল। চন্দনাই প্রথম বলল, এখানে একটা বাড়ি করলে হয় না? আমরা মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকব! তখন আমি বললাম, নিজেদের জন্য বাড়ি কেনার কোনো মানে হয় না। কতদিনই বা থাকব! তারচেয়ে কোম্পানির জন্য একটা গেস্ট হাউজ বানানোই ভালো। ভাড়া দিয়ে ক্যাপিটালটা উঠে আসবে, ইচ্ছে করলে আমরাও এখানে এসে থাকতে পারব।

ভাগ্যিস এবার চন্দনা তোর সঙ্গে আসে নি।

ভাগ্যিস কেন? এলে কী হতো?

তাহলে চন্দনার ভয়ে ঐ অপরূপা সুন্দরীকে তোর দেখতে পাওয়া হতো না!

যাহ্! শুধু দেখায় কী দোষ? মুখে কিছু বলতাম না। চন্দনা নিজেই গরজ করে আশ্রমে যেতে চাইত। ও পুজো-টুজো দিতে ভালোবাসে, আমার মতোন নয়।

বেদান্ত আশ্রমটি মহুল ডেরার একেবারে অন্য প্রান্তে। ফাঁকা জায়গা, আশ্রম ভবন ছাড়া কাছাকাছি অন্য পাকাবাড়ি নেই, এক পাশে এত গাছপালা যে মনে হয় জঙ্গলের মতোন।

আগেকার দিনে ধর্মস্থানগুলি থাকত অবারিত দ্বার। এখন দিনকাল বদলেছে। চোর-ডাকাতরা ধর্ম মানে না, তাদের পাপের ভয়ও নেই। মন্দিরের মূর্তির গলার সোনার হার চুরি যায়। এমনকি দামি ধাতুর মূর্তি হলে পুরো মূর্তিটিই কেউ চুরি করে পালিয়ে যায়, কিন্তু কোনোদিন শোনা যায় নি, সেই চোর দেবতার অভিশাপে ভস্ম হয়ে গেছে। চোরেরাও সেটা জানে। পুলিশ ধরতে না পারলে তারা দিব্যি ঘুরে বেড়ায়। সব দেশই ধরা-না-পড়া চোরে ভর্তি।

এখন আশ্রমের সামনে লোহার গেট, দু'পাশে দু'জন পাহারাদার। দিনেরবেলা গেট অবশ্য খোলা থাকে।

রবি ঠিকই বলেছে, এখনো এখানে তেমন ভিড় জমে নি। গেট থেকে সোজা এদিকে গেলে শ্বেতপাথরের মন্দির। কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয়। সবকিছু বেশ পরিষ্কার, ঝকঝকে।

মন্দিরের একেবারে ভেতরের দিকে কিসের একটা মূর্তি রয়েছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বাইরের লোক মূর্তির খুব কাছে যেতে পারে না, একটা কাঠের জালির বেড়া রয়েছে। মাঝখানের অনেকটা অংশ ফাঁকা, বোধহয় পুজো-টুজোর সময় ঐখানে আশ্রমবাসীরাই বসে।

সামনের অংশে চার-পাঁচজন লোক বসে আছে হাতজোড় করে। অতনু আর রবি তাদের পাশে গিয়ে বসল, হাতজোড় করল না। ভেতরে মূর্তিটার কাছে ওদের দিকে পেছন ফিরে বসে আছে তিনটি রমণী, সেই অবস্থাতেই বোঝা যায় তাদের মধ্যে একজন কালকের সেই অতুলনীয়া।

পুজো শুরু হতে দেরি হচ্ছে, ঐ তিন রমণী মূর্তিটিকে ফুল টুল দিয়ে সাজাল।

অতনু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, বেদান্ত ব্যাপারটা কী, খুব সংক্ষেপে আমাকে বুঝিয়ে দে তো!

রবি বলল, তুই বেদ পড়েছিস কখনো?

অতনু বলল, ওরে বাবা, সে তো খুব শক্ত বই। সংস্কৃত পড়তে গেলে দাঁত ভেঙে যায়। না, আমি কখনো চেষ্টাও করি নি পড়ার।

রবি বলল, বাংলা অনুবাদেও পাওয়া যায়। যাই হোক, বেদের অন্ত, মানে শেষ দিকের অংশটাকে বলে জ্ঞানকান্ড। তাতে একটা দর্শনের কথা আছে। মূল কথাটা হচ্ছে জীবাত্মা আর পরমাত্মার মিলেমিশে এক হয়ে যাওয়া।

অতনু বলল, ওসব আমার মাথায় ঢুকবে না। পরমাত্মা মানে কি পরমব্রহ্ম? তার কোনো মূর্তি থাকে?

রবি বলল, না। হিন্দুদের পরমব্রহ্মও নিরাকার ঈশ্বর। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা বুঝবে না কিংবা কল্পনায় ঠিক ধরতে পারবে না বলে একটা না একটা দেব-দেবীর পূজো হয়। এইসব দেব-দেবীই পরমব্রহ্মের অংশ। এখানে মনে হচ্ছে একটা কৃষ্ণের মূর্তি রয়েছে। কৃষ্ণ তো আসলে একটা মিথ।

অতনু একটু অস্থিরভাবে বলল, মেয়েগুলো একবার এদিকে ফিরছে না কেন?

রবি বলল, ধৈর্য ধর বৎস! একটু কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।

অন্য ভক্তরা ওদের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। তারা সবাই বুড়োবুড়ি। এরা দু'জন যুবক, দেখলেই বোঝা যায় স্থানীয় নয়, এরকম কেউ সচরাচর এত সকালে আসে না। তাছাড়া এই ভাবগম্ভীর পরিবেশে সবাই চুপ করে থাকে, এরা দু'জন ফিসফিসিয়ে কথা বলছে।

একটু পরে সেই তিন রমণী উঠে গিয়ে মূর্তিটার পেছন দিকে দাঁড়াল। সেখানেও কী সব সাজাচ্ছে।

এবার দেখা যাচ্ছে তাদের মুখ ও সম্মুখ শরীর। আজও লাল পাড় সাদা শাড়ি পরা। আঁচল কাঁধে জড়ানো। অন্য মেয়ে দুটির সাধারণ চেহারা, মাঝখানের মেয়েটি সত্যিই অসাধারণ রূপসী। রঙ ও শরীরের গঠনে তো বটেই, মুখশ্রীতে রয়েছে এমন একটা গভীর নিবিষ্টতার ভাব, যা খুবই দুর্লভ।

অতনু দারুণ তৃষ্ণার্তের মতোন চেয়ে রইল তার দিকে।

সেই তিন রমণী বাইরের লোকদের দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করল না। একটু পরেই চলে গেল ভেতরের দিকে।

ওরা দু'জন আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রইল। একজন পুরুত টাইপের লোক এসে ঘণ্টা বাজানো শুরু করল, মেয়ে তিনটি আর ফিরল না।

অতনু রবিকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

বাইরে এসে রবি বলল, কী রে, সাধ মিটেছে ?

অতনু বলল, সাধ কি আর মেটে ? আরো তৃষ্ণা বেড়ে যায়। একবার অন্তত কথা বলারও চান্স পাওয়া যাবে না ? ওর গলার আওয়াজটা শুনতাম। নিশ্চয়ই বাইরের লোকদের সঙ্গে এদের কথা বলা নিষেধ।

এরা কনভেন্টের নানদের মতোন ? একা একা দোকান-বাজারও করতে যায় না ?

মোস্ট প্রোভাবলি, নো।

কী দারুণ সেক্সি চেহারা! এরকম আগে আর দেখি নি!

সেক্সি ? তা হবে! তোর মতোন যার মাথায় সবসময় সেক্স ঘোরে, তার ওরকম মনে হবেই।

শালা, তোর মাথায় সেক্স নেই ? এরকম একটি রমণী রত্ন সংসার ধর্ম পালন না করে কেন এরকম একটা আশ্রমে ঢুকে বসে আছে, তা তোর জানতে ইচ্ছে করে না ?

যে-কোনো মানুষের জীবনেই একটা করে গল্প থাকে। একটি সুন্দরী মেয়ের জীবনের গল্প বেশি আকর্ষণীয় হবেই। তবে, সন্ন্যাসিনীরা আগেকার জীবনের কথা কিছুই বলে না।

ইস, যদি মেয়েটার নামটাও জানতে পারতাম!

এবারে রবি রহস্যময়ভাবে হেসে বললেন, ওর নাম আমি জানি!

অতনু সিঁড়িতে থেমে গিয়ে বলল, তুই ওর নাম জানিস ? সত্যি ?

রবি বলল, হ্যাঁ জানি। ওর নাম শকুন্তলা। আর দু'পাশের দুটি মেয়ের নাম অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা।

তুই বানাচ্ছিস।

আর তুই হচ্ছিস রাজা দুষ্মন্ত। আমি কে জানিস ? দুষ্মন্তের একজন বিদূষক ছিল, আমি হচ্ছি সে। আমি তোকে ভালো ভালো পরামর্শ দিতে পারি, কিন্তু তা শুনবি না।

কী পরামর্শ দিবি, শুনি!

সখা, আগেকার দিনের রাজাদের পাঁচটা-দশটা বউ থাকত। তা ছাড়াও রাজারা যে-কোনো মেয়েকে ইচ্ছে করলেই ভোগ করতে পারত। সেইসব রাজা-টাজাদের দিন শেষ। এখন বিবাহিত পুরুষদের একটি মাত্র বউ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এখন কোনো বিবাহিত লোক অন্য মেয়ের সঙ্গে অ্যাফেয়ার করতে গেলে তাকে বলে ব্যভিচার। ধরা না পড়লে ঠিক আছে, কিন্তু ধরা পড়লে খুব ঝামেলা। সংসার ভাঙে, অনেক শাস্তিও পেতে হয়। সুতরাং, ও মেয়েটির দিক থেকে মন ফেরাও। মন থেকে মুছে ফেল। নতুন ব্যবসা বাড়াচ্ছ, তাই নিয়ে থাকো।

ধ্যাৎ! ব্যভিচার-ট্যাভিচারের কথা আসছে কেন ? এমনিই কারুকে ভালো লাগলে আলাপ করা যায় না ? দেখিস, ওর সঙ্গে একদিন আমি আলাপ করবই করব!

তিন

ওসমান সাহেবের খাতির যত্নের চোটে কয়েক দিনের মধ্যেই ওদের ওজন বেড়ে যাবার উপক্রম। প্রত্যেকদিন দু'বেলা এত মসলা দেওয়া খাবার খাওয়ারও তো অভ্যেস নেই কারুর।

আজ ওরা চলে এসেছে নিজেদের নতুন বাড়িতে।

বাড়িটি দোতলা, মোট সাতখানা ঘর। সামনে পেছনে বারান্দা। বাগানও আছে। এ বাড়ি ওসমান সাহেব কিনেছিলেন এক সাহেবের কাছ থেকে। এক সময় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা এই ধরনের নিরিবিলি পাহাড়ি জায়গায় বাড়ি বানিয়ে কাটাতো শেষ জীবন। হঠাৎ এক সময় তাদের অস্ট্রেলিয়া যাবার সুযোগ খুলে যায়। তখন জলের দরে এখানকার বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছে।

বাড়িটার অনেক অংশ এখনো মেরামত করা বাকি আছে; তবে একটা ঘর একেবারে তৈরি। নতুন রঙ করাও হয়েছে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে অতনু ও রবি কিছু কিছু ফার্নিচার ও খাট বিছানা কিনেছে। এই ঘরটা কোম্পানির ডিরেক্টরদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

দক্ষিণ দিকের জানলা খুললেই পাহাড়টা দেখা যায়। ট্রেনের যাওয়া-আসাও চোখে পড়ে, শব্দ শোনা যায় না। দূর থেকে ট্রেন দেখলে এখনো বাচ্চা বয়েসের মতোন ভালো লাগে।

অতনু কোনো রকম আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাস না করলেও চন্দনা বিশেষ করে বলে দিয়েছে, একটা কিছু গৃহ-প্রবেশের পুজো টুজো করতেই হবে, বিশেষত ভূতের বাড়ি। চন্দনার নিজেরই আসার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এই শনিবারই তাকে যেতে হয়েছে বার্লিনে, তার দিদির মেয়ের বিয়ে। ওর টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে।

দুপুরে একজন পুরুত এসে ঘণ্টা ফন্টা নেড়ে কী সব মন্ত্র পড়ে গেছে। দক্ষিণা নিয়েছে একশ' পঁচিশ টাকা। সস্তাই বলতে হবে, কোলকাতার পুরুতরা অনেক বেশি নেয়।

এখানে অনেক জিনিসই এখনো কিছুটা সস্তাই আছে। বাজার ঘুরে দেখেছে অতনু। তরকারি-শাকসবজি যেমন টাটকা, তেমনই কম দাম। পাঁঠার মাংসের দামও দশ টাকা কম কোলকাতার চেয়ে। তবে মাছটা ভালো পাওয়া যায় না। কাছাকাছি বড় নদী নেই। এটা একটা খুঁত। বাঙালিরা যেখানেই যায়, মাছ খেতে চায়। অবশ্য এখনকার বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা মাছ পছন্দ করে না। এখানে মাংস-মুর্গি সস্তা, এটাই ভালো করে পাবলিসিটি দিতে হবে।

সন্ধের সময় ওসমান সাহেব মালপত্রসমেত ওদের স্টেশনে দিয়ে এলেন। বিকেলবেলা ওঁর বাড়িতে স্থানীয় দারোগার সঙ্গে নেমন্তন্ন ছিল। দারোগার নাম বিনয়, পাহাড়ের অধিবাসী। পুলিশ-টুলিশের সঙ্গে পরিচয় থাকা ভালো।

ওসমান সাহেব আজ রাতে এখানে আসবেন, থাকবেন না, তাঁর বাড়িতে আজ মেহমান আসবে। তবে, আজ রাতের খাবারও আসবে তাঁর বাড়ি থেকে, এখানে রান্নার ব্যবস্থা করা যায় নি। ফোটানো জল সঙ্গে আনা হয়েছে পাঁচ বোতল। অতনু নতুন জায়গার জল বিশ্বাস করে খেতে পারে না। যদিও আগেকার দিনে বলা হতো, এমন জায়গায় এসে জল খেলে তাড়াতাড়ি সব কিছু হজম হয়ে যায়, খিদে বাড়ে। এখন অতনুর পেটের চরিত্র বদলে গেছে।

বিদায় বলবার আগে ওসমান সাহেব বললেন, সব ঠিক আছে ? কোনো অসুবিধা হবে না আশা করি।

না, না, আপনার ব্যবস্থাপনার কোনো ত্রুটি নেই। কী করে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব।

এ আর এমন কী। মানুষের সঙ্গে শুধু কাজ-কর্মের সম্পর্ক ছাড়াও তো বন্ধুত্ব হতে পারে। বাই দা ওয়ে, এখানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব নেই, খুব পিসফুল জায়গা, তবে আপনাদের ভূত-টূতের ভয় নেই তো ?

রবি অতনুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, আমার এই নাস্তিক বন্ধুটি ভূত বা ভগবান, কোনোটিতেই বিশ্বাস করে না।

ওসমান সাহেব একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, এই দুটার মধ্যে মিল কোথায় তা তো বুঝলাম না ?

রবি বলল, ভূত বা ভগবান, দুটোকেই কখনো দেখা যায় না। অদৃশ্য। সেই জন্যই অবিশ্বাস।

ওসমান বললেন, ভগবানকে চোখে দেখা যায় না ঠিকই, কিন্তু ভূত তো কেউ কেউ দেখেছে।

এবার অতনু জিজ্ঞেস করল, আপনি দেখেছেন ? নিজের চোখে ?

না, মানে, আমি কখনো দেখি নাই, কিন্তু কেউ কেউ খুব রিলায়েবল—

কেউ দেখে নি। ভূত কেউ নিজের চোখে দেখে না। অন্য কেউ দেখেছে, সেই উদাহরণ দেয়। অন্য কেউও আসলে দেখে না। যদি কেউ বলে, হ্যাঁ, আমি দেখেছি, তাহলে বলতে হবে, সে একটা ডাহা মিথুক! কিছুটা হ্যালুসিনেশানে ভোগে। তার অসুখ আছে। এ নিয়ে অনেক গল্প ছড়ায়। কিন্তু কেউ দেখে না। আপনি বুঝতে পারছেন না, ওসমান সাহেব, একজন মৃত মানুষকে যদি আবার দেখা যায়, তাহলে তো ফিজিকসের থিয়োরিটাই মিথ্যে হয়ে যায়।

রবি বলল, ভূত বিশ্বাস না করলেও অনেকে ভূতের ভয় পায়।

অতনু বলল, দ্যাটস রাইট। সেটা মন্দ নয়। দড়াম করে একটা দরজা খুলে গেল, ফিসফিসানি শোনা গেল বাতাসে, সিঁড়িতে কার যেন পায়ের শব্দ মাঝ রাতে, এসব শুনলে বুকটা ধক করে উঠবে, বেশ রোমাঞ্চ হবে, সেটা উপভোগ করা যাবে। অবিশ্বাস যদি দৃঢ় হয়, তাহলে তো আগেই জানা থাকবে যে কোনো অশরীরীর পক্ষেই মানুষের কোনো ক্ষতি করা সম্ভব না। মানুষকে ছুঁতেই পারবে না!

ওসমান বললেন, আপনার মশাই সত্যিই মনের জোর আছে। আমিও ঠিক বিশ্বাস করি না, কিন্তু একলা বাড়িতে থাকতে পারি না। ঠিক আছে, গুড নাইট!

অতনুও বলল, গুড নাইট। খোদা হাফেজ!

ফিরে দাঁড়িয়ে ওসমান হেসে বললেন, আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, তবে খোদা হাফেজ বললেন কেন ?

অতনু বলল, ওটা তো একটা বিদায় সম্বোধন। এসব তো কেউ মানে বুঝে বলে না। সামাজিকতা হিসেবে বলাই যায়। আমরা তো মেরি ক্রিসমাসও বলি!

ওসমান বললেন, আচ্ছা তবে খোদা হাফেজ। নটা সাড়ে নটায় আমার লোক এসে খাবার দিয়ে যাবে। তারপর দরজা-টরজা বন্ধ করে দেবেন!

ওসমান চলে যাবার পর অতনু বলল, উফ!

রবি জিজ্ঞেস করল, উফ করলি কেন ? ভদ্রলোক ভালো মানুষ, এত উপকার করছেন, তুই কি তবু বিরক্ত হচ্ছিলি নাকি ?

না, তা নয়। ভদ্রলোক সত্যিই ভালো মানুষ। বিরক্ত হবার কোনো কারণ নেই। তবু কি জানিস, সর্বক্ষণ একজন অন্য লোক কাছে থাকলে নিজেদের মধ্যে হার্ট টু হার্ট কথা বলা যায় না। খিস্তি-খেউড় করা যায় না।

মেয়েছেলে নিয়ে আলোচনাও করা যায় না। একজন মেয়ে উপস্থিত থাকলেও এরকম হয়।

আমি কোনো মেয়ে উপস্থিত থাকলে আগেই জিজ্ঞেস করি, অ্যাডাল্ট তো ? সব ধরনের কথা হজম করতে পারবে তো ? তারপর প্রাণখুলে যা-খুশি তাই বলি!

তোর বউয়ের সামনে তো বলতে পারিস না। চন্দনা খুব কড়া ধাতের মেয়ে।

আঃ, তুই সব সময় আমার বউকে টেনে আনিস কেন ? মাল ফাল খাবি না ? ঢাল না গেলাসে।

দুটি গেলাসে হুইস্কি ঢালল রবি। এখানে সোডা পাওয়া যায় না, শুধু জল মেশাতে হবে।

গেলাস তুলে অতনু বলল, চিয়ার্স!

রবি বলল, বাংলাদেশে বসে উল্লাস।

ফরাসিরা বলে, আ ভত্র শান্তে। মানে জানিস ?

জানতে চাই না। চুমুক দিয়েই আমার প্রথম কী মনে হলো জানিস ? তুই যে চ্যালেঞ্জ করেছিলি, শকুন্তলার সঙ্গে ঠিক আলাপ করবি। কই, পারলি ?

অতনু একটুক্ষণ চুপ করে রইল।

এর মধ্যে সে আরো তিনবার গিয়েছিল বেদান্ত আশ্রমে। একদিন সকালে ও দু'বার বিকেলে। পুজো-টুজো ছাড়াও ওখানে নানারকম সেবামূলক কাজকর্ম হয়। অনেকটা রামকৃষ্ণ মিশনের মতোন। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে গ্রামের মানুষরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করায়। ব্লাড টেস্টেরও ব্যবস্থা আছে। পোশাক বিতরণ হয়, একটা ইস্কুল বাড়িও তৈরি হচ্ছে। গাড়ি-চড়া বাবুরা এসব কাজ পরিদর্শনে আসে, বোঝা যায়, বাইরে থেকে আসে অনেক টাকা। বিদেশী সাহায্যও থাকতে পারে।

এই তিনবারের মধ্যে একবার মাত্র দূর থেকে সেই মেয়েটিকে এক ঝলক দেখেছে অতনু। অন্য দু'বার দেখাই হয় নি, কথা বলার সুযোগের তো প্রশ্নই ওঠে না।

সিগারেটে টান দিয়ে অতনু বলল, আমি যেটা জেদ ধরি, সহজে ছাড়ি না। আর কটা দিন থাকতে পারলে ডেফিনিটলি আলাপ করে নিতে পারতাম। কিন্তু চন্দনা এখন বার্লিনে, আমি বেশিদিন এখানে থাকলে ব্যবসাটা দেখবে কে ? তাই আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে। আবার শিগগিরই আসব। তখন আর একবার

রবি বলল, ধরা যাক, মেয়েটির সঙ্গে তোর দেখা হলো। তুই প্রথমেই কী কী বলবি ?

বলব তুমি কী সুন্দর!

কোন ভাষায় বলবি!

তার মানে ?

যদি বাংলায় বলিস, আর মেয়েটি যদি বাঙালি না হয় ? কিছুই বুঝবে না। অমন গায়ের রঙ কি বাঙালি মেয়েদের হয় ?

তুমি কী সুন্দর, এটা একটা ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ। সবাই বুঝবে!

মোটেই না। ওড়িয়া, অসমিয়া এমনকি বিহারি হলেও বাংলা বুঝতে পারবে, কিন্তু যদি কাশ্মীরী হয় ? এক বর্ণও বুঝবে না। ওকে দেখতে অনেকটা কাশ্মীরী মেয়েদেরই মতন।

এখানে কাজ করছে, নিশ্চয়ই বাংলা শিখে নিয়েছে।

মনে হয় লেখাপড়া জানে। সেফ সাইডে থাকার জন্য প্রথম সেনটেন্সটা ইংরেজিতে বলাই ভালো। কিন্তু কথা হচ্ছে, 'তুমি কী সুন্দর' শুনলে অধিকাংশ মেয়েই খুশি হয়। কিন্তু যে মেয়ে সংসার ছেড়ে এসেছে, সেও কি খুশি হবে ? বরং বিরক্ত হতে পারে। রূপের সঙ্গে জড়িত থাকে কামনা-বাসনা, সেসব ছেড়েই তো ও সন্ন্যাসিনী হয়েছে।

আমি এর পরেই তো জিজ্ঞেস করব, তুমি এই ভরা যৌবনে সংসার ছেড়ে এসেছো কেন ? আসলে সেইটুকু কৌতূহল মেটানোই তো আমার উদ্দেশ্য!

তুই প্রথম আলাপে জিজ্ঞেস করলেই সে গড়গড় করে বলে দেবে ? সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা তাদের আগের জীবন নিয়ে কোনো কথাই বলতে চায় না, সেইজন্য তারা নামও বদলে ফেলে। অতনু, তোর চেহারা টেহারা ভালো, এমনি মেয়েরা তোকে দেখলে খানিকটা চুম্বক মেরে যায়, কিন্তু মনের জোরে যে সংসার ছেড়েছে, সে তোকে বিশেষ পাত্তা দেবে বলে মনে হয় না!

দ্যাখ রবি, তুই প্রথম থেকে আমাকে ডিসকারেজ করতে চাইছিস! আমার সঙ্গে যদি একবার আলাপ হয়, ঠিক ওর পেটের কথা বার করে ফেলব।

আমার কী ভয় হয় জানিস, ওর সঙ্গে ঐ ধরনের কথা বললে তোকে হয়তো অপমানিত হতে হবে।

যাক গে, বাদ দে, ওসব কথা এখন বাদ দে। আমাদের এই গেস্ট হাউজটার নাম কী হবে? তোকে ভাবতে বলেছিলাম না?

ভেবেছি। আমার মনে হয়, কোনো সৌখিন নাম দেবার বদলে খুব সহজ, সাধারণ নাম, যেমন মহুল ডেরা ভ্যাকেশান লজ, এই রকমই ভালো। মহুল ডেরা নামটা কোলকাতার লোকদের কাছে পরিচিত নয়। বেশ একটা এক্সটিম ভাব আছে।

ইংরেজি নাম!

বাংলা নাম দিলে লোকে ভাববে সস্তার জায়গা। আর সস্তা মানেই মিস ম্যানেজমেন্ট। তোকে ধরতে হবে আবার মিডল ক্লাস ক্লায়েন্টেস। অবাঙালিরাও আসতে পারে।

প্রথমে তো ঠিক করেছি, কয়েক মাস থাকবে ঘর ভাড়া পার ডে দুশ' টাকা। সাধারণ মধ্যবিত্তরাও আসতে পারবে। মাস ছয়েক পরে অবশ্য ভাড়া বাড়াবো। খুব গরমের সময়, লিন সিজন, তখন আবার রেট কমাতেও হতে পারে।

ইলেট্রিসিটি এসে গেছে, গোটা তিনেক ঘর এয়ার কন্ডিশান করে দিতে পারিস। তাতে লোকে আরামে পাঁচশ'-সাতশ' টাকা দেবে।

তুই যখনই আসবি, তোর জন্য ফ্রি। তুই এই ঘরটায় থাকবি।

আমি একা আসব? এখানে কেউই একা আসবে না, সবাই মেয়ে-টেয়ে নিয়েই আসবে।

তুই বুঝি সারা জীবনে আর কোনো মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করবি না? তুই তো দেখছি, সন্যাসীর মতোন বকে যাচ্ছিস রে, রবি!

না, আমি সন্ন্যাসী হতে পারব না। কারণ, আমি মদ খাই, সিগারেট খাই। মেয়েদের কাছে না ঘেঁষলেও মেয়েদের কথা তো চিন্তা করি অবশ্যই!

আচ্ছা, সাধু-সন্ন্যাসী, ফকির-দরবেশ এরা কি সত্যিই মেয়েদের কথা চিন্তা করে না? এরা লিবিডো দমন করে কী করে?

সেটা ওঁদের অবস্থায় না পৌছলে আমরা বুঝতে পারব না। হয়তো সাধনা-টাধনা করলে মনের জোর অনেক বেড়ে যায়।

কিছু কিছু সো-কলড সাধু তো মেয়েদের নিয়ে বেলেল্লাও করে। মাঝে মাঝে কাগজে বেরোয়।

তারা সো-কল্ড সাধু। খাঁটি নয়। তাদের কয়েকজনের জন্য সবাইকে ছোট করে দেখা ঠিক নয়। অনেকে নিশ্চয়ই সাধনার উচ্চমার্গেও ওঠে।

আমি তো মনে করি, কর্মই সাধনা!

এইসব কথাবার্তার মধ্যে মদ্যপানও চলছে। বোতল অর্ধেক খালি। অতনু একবার ঘড়ি দেখল। মাত্র সাড়ে আটটা বাজে।

হঠাৎ একসময় শোনা গেল সিঁড়িতে কয়েকটি পায়ের শব্দ। ফিসফাস কথা। দোতলার কাছে এসে সব থেমে গেল। আবার চুপচাপ।

অতনু রবির দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। প্রথমে মনে হয়েছিল, বাইরে থেকে কেউ দেখা করতে আসছে। তারপর শব্দ থেমে গেল কেন? এই কি ভূতের ব্যাপার? ফিজিক্সের থিয়োরি মিথ্যে হয়ে যাবে?

রবি বলল, আমি বাইরেটা দেখে আসছি।

সে উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ভেজানো দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। সেখানে দাঁড়ানো তিনজন যুবক। না, ফিজিক্সের থিয়োরি মিথ্যে হয় নি, এরা সত্যিকারের মানুষ।

তিনজনই প্যান্ট-শার্ট পরা, মাঝারি চেহারা, বয়েস পঁচিশ থেকে পঁয়তিরিশের মধ্যে। মাঝখানের যুবকটি একটু বেশি লম্বা, চোখে চশমা, মাথার ঝাঁকড়া চুলে কখনো চিরুনি ব্যবহার করে বলে মনে হয় না।

সে তীব্র গলায় বলল, আপনারা কে? এখানে কী করছেন?

ভুরু কুঁচকে অতনু বলল, সে প্রশ্ন তো আমরাই করব। আপনারা কে? এখানে কেন এসেছেন?

লোকটি ধমক দিয়ে বলল, যা জিজ্ঞেস করছি উত্তর দিন?

রবি জানে, অতনু বদ-মেজাজি, কারুর খারাপ দেখলে পট করে একটা অশ্লীল গাল দিয়ে ফেলতে পারে।

সে হাত তুলে বন্ধুকে নিবৃত্ত করে শান্ত গলায় বলল, আমরা এই বাড়ির মালিক, আমরা এখানে থাকব, সেটাই তো স্বাভাবিক।

আমাদের বাড়ি মানে?

আমরা এই বাড়িটা কিনেছি। আজই দখল নিয়েছি।

কিনেছেন? এই অঞ্চলে সমস্ত বিক্রি নিষেধ, তা জানেন না?

নিষেধ? গভর্নমেন্টের সার্কুলার আছে। সেরকম তো কিছু শুনি নি।

গভর্নমেন্টের নয়, আমাদের সার্কুলার। ঐ ওসমান ব্যাটা বুঝি চুপি চুপি আপনাদের এই বাড়িটা গছিয়েছে? ব্যাটা মহা ধড়িবাজ ক্যাপিটালিস্ট!

চুপি চুপি কেন হবে? রীতিমতোন দর-দাম করে... আমরা উকিল দিয়ে বাড়ির টাইটেল সার্চ করিয়েছি, কোর্টে রেজিস্ট্রি হবে

সেসব কিছু হবে না! এ বাড়িতে এখন রাত্তিরে আমরা থাকি।

এবার অতনু বলে উঠল, সেই জন্যই বুঝি ভূতের গল্প রটানো হয়েছে!

লম্বা লোকটির একজন সঙ্গী বলল, শাট আপ!

রবি নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করল, আপনারা এ অঞ্চলের সব বাড়ি বিক্রি না করার সার্কুলার দিয়েছেন কেন জানতে পারি। যদি কেউ অভাবে পড়ে বেচতে চায়

লম্বা লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আপনারা এই বাড়িটা কিনতে চাইছেন কেন? এখানে এসে পাকাপাকি বসবাস করবেন? নিশ্চয়ই না। এটা বাগানবাড়ি বানাতে চান?

রবি বলল, ঠিক তা নয়। আমাদের একটা ট্রাভেল এজেন্সি আছে। এ বাড়িটাকে আমরা একটা গেস্ট হাউজ বানাবো। শহর থেকে লোকেরা আসবে।

অতনু বলল, বাইরের লোকরা এখানে আসবে, তারা জিনিসপত্র কিনবে, টাকা খরচ করবে, তাতে এখানকার স্থানীয় লোকদেরই তো উপকার হবে!

আ-হা-হা-হা! স্থানীয় লোকদের উপকারের চিন্তায় যেন আপনাদের ঘুম নেই! আপনারা গেস্ট হাউজ করছেন নিজেদের ব্যবসার জন্য! শহর থেকে লোকেরা এখানে ফুর্তি করতে আসবে। নিজের বউ ছাড়া অন্য মেয়ে নিয়ে আসবে। মদ খাবে!

লম্বা লোকটির একজন সঙ্গী বলল, মধুদা, এরা দু'জনেও তো বসে বসে মদ প্যাদাচ্ছে।

অতনু বলল, মদ্যপান সম্পর্কে আপনাদের খুব আপত্তি দেখছি। আপনারা খান না বুঝি? এখানকার সব আদিবাসীরাই তো মদ খায় রোজ। হাঁড়িয়া, মহুয়া। আপনারা বুঝি বিপ্লবী? কার্ল মার্কস কিংবা লেনিন মদ খেতেন কি না খোঁজ নিয়েছেন? ওসব দেশে তো সবাই ভদকা খায়!

অন্য লোকটি বলল, শাট আপ!

এবার অতনুও গর্জে উঠে বলল, ইউ শাট আপ! অ্যান্ড গেট আউট ফ্রম মাই প্রপার্টি!

লম্বা লোকটি পকেট থেকে একটা রিভলবার বার করে গুলি চালালো তিনবার।

দুটো গুলি অতনুর গায়ে লাগল, ঢলে পড়ে গেল সে!

চার

অতনুর জ্ঞান ফিরল প্রায় দু'দিন পরে। তাও অ্যানেসথেসিয়ার ঘোর রয়েছে খানিকটা। চোখ মেলে সে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখে জিজ্ঞেস করল, এ জায়গাটা কোথায়?

গলায় স্টেথোসকোপ ঝোলানো একজন ডাক্তার, তাঁর পাশে দুটি তরুণী। তাদের মধ্যে একজন সেই পরমা সুন্দরী। যার সঙ্গে পরিচয় করার জন্য অতনু ব্যাকুল হয়েছিল। কিন্তু এখন অতনু তাকে চিনতে পারল না। শরীর অসুস্থ থাকলে ওসব মনে পড়ে না।

ডাক্তাররা মৃদু স্বরে বলল, আপনি আমাদের আশ্রমের হাসপাতালে। ইউ আর কমপ্লিটলি সেইফ নাও!

অতনু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, আমি হাসপাতালে কেন? আমার কী হয়েছে? অ্যাকসিডেন্ট?

আপনার মনে নেই, কী হয়েছিল?

নো। আই ডোনট রিমেমবার এনিথিং। আমি হাসপাতালে... আমার কি একটা পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে?

না, না। পা ঠিক আছে। আপনার দুটো গুলি লেগেছে, দুটোই সাকসেসফুলি রিমুভ করা গেছে। একটা গুলি লেগেছিল হার্টের ঠিক তিন ইঞ্চি নিচে, ওটা ফেটাল হতে পারত। অন্যটা কাঁধে।

অতনু ঠিক বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, আমার দুটো হাত কোথায়? ঠিক আছে!

ডাক্তার বললেন, হাতও ঠিক আছে।

কোথায়? আমার হাত কোথায় দেখান?

একটা হাত তো দেখানো যাবে না, বুকের সঙ্গে ব্যান্ডেজ বাঁধা। অন্য হাতটা আপনি অনায়াসে তুলতে পারবেন।

অতনু আপন মনে বলল, পা ঠিক আছে, হাত ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে শুয়ে আছি কেন?

ডাক্তার হেসে বললেন, একটু তো শুয়ে থাকতেই হবে। কয়েকদিন বিশ্রাম দরকার।

অতনু চোখ বুঁজল।

একটু পরে ডাক্তার ও একটি তরুণী বেরিয়ে গেল। অন্য তরুণীটি একটা টুলে বসে রইল তার শিয়রের কাছে।

অতনু তাকে অগ্রাহ্য করে পাশ ফিরল অন্য দিকে।

প্রায় ছ'ঘন্টা পরে সে আবার চোখ খুলল। এখন ডাক্তারটি নেই, রয়েছে দুটি মেয়ে।

একজন বলল, এবারে একটু খেয়ে নিন, সারাদিন পেটে কিছু পড়ে নি।

অতনু জিজ্ঞেস করল, কী খাব? খিদে তো পায় নি।

অন্যজন বলল, খিদে না পেলেও একটু খেয়ে দেখুন। যতটা পারেন। আজ লিকিউড, কালকেই ভাত পাবেন।

একটা পোর্সিলিমের বাটি থেকে চামচে করে তুলে অতনুকে কিছু একটা তরল খাদ্য খাওয়াতে লাগল মেয়েটি।

অতনু মুখ কুঁচকে বলল, একটুও ঝাল নেই। লঙ্কা দেয় নি কেন?

মেয়ে দুটিই হাসল। হাসপাতালের রোগীকে ঝাল খাবার দেবার কথা কেউ কখনো শোনে নি। সব হাসপাতালের খাবারের স্বাদ এক।

বারবার আপত্তি জানিয়ে মাথা নাড়ছে অতনু, মেয়েটি বেশ শক্ত করে তাকে ধরে আছে। একবার সে অন্যজনকে বলল, জলের গেলাসটা দে তো দীধিতি!

অতনু শুনল, একটি মেয়ে অন্য মেয়েটিকে ডিডিটি বলে ডাকছে। ডিডিটি কারুর নাম হয় ? হাসপাতালে ডিডিটি কাজে লাগে...।

যাকে ঐ নামে ডাকা হলো, সে সেই খুব ফর্সা রূপসীটি। কিন্তু তার রূপের প্রতি এখন কোনো আকর্ষণ নেই অতনুর, শুধু নামটা শুনে তার খটকা লেগেছে।

একবার সে বলেই ফেলল, কী নাম বললে ওর ? ডিডিটি ?

দুজনেই হাসল।

একজন বলল, প্রথমে ওর নাম শুনে সবাই অন্য একটা কিছু ভাবে। আমার নাম অনুপমা, ওর নাম দীধিতি। দী-ধি-তি।

অতনু জিজ্ঞেস করল, এটা কি বাংলা ?

হ্যাঁ, বাংলাই বলতে পারেন। সংস্কৃত থেকে এসেছে

মানে কী ?

এবারে যার নাম, সে-ই খুব নম্র গলায় বলল, দীপ্তি, রশ্মি।

কখনো শুনি নি।

আর আগ্রহ হারিয়ে ফেলে সে খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে বলল, আর, আর খেতে ইচ্ছে করছে না, কেন জোর করছো! আমার ঘুম পাচ্ছে!

আবার সে জেগে উঠল, মধ্যরাতে।

ঘরের এককোণে টেবল ল্যাম্প জ্বলছে, সেখানে টুলে বসে বই পড়ছে একটি মেয়ে। অনুপমা না দীধিতি, কোন্‌জন, তা সে চিনতে পারল না। নাম দুটোও মনে নেই। অনেক কিছুই তার মনে নেই।

চোট লেগেছে তার শরীরে, কিন্তু তার মাথার মধ্যেও খানিকটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে।

তাকে নাড়াচাড়া করতে দেখে মেয়েটি উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনার কিছু কষ্ট হচ্ছে ? জল খাবেন ?

অতনু বলল, না।

মেয়েটি বলল, এখন সাড়ে বারোটা বাজে, আপনার ব্লাড প্রেসারটা একবার চেক করব ?

অতনু কোনো উত্তর দিল না।

মেয়েটি অতনুর অক্ষত হাতটিতে পট্টি জড়াতে লাগল।

নির্জন ঘর, এত কাছাকাছি একটা তরুণী মেয়ে, তার নিঃশ্বাসও গায়ে লাগছে, তবু ভোগবাদী অতনুর শরীরে কোনো সাড়া নেই।

একটু পরে সে জিজ্ঞেস করল, আমার নাম কি অতনু হালদার ? তুমি জানো ?

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ, কার্ডে তাই লেখা আছে।

আমি কি কারুর সঙ্গে মারামারি করেছিলাম ?

তা জানি না। রিপোর্টে লেখা আছে, আপনার গায়ে গুলি লেগেছে দুটো। পুলিশ এসেছিল আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে। আপনি ঘুমোচ্ছিলেন, তাই জাগাই নি। কাল সকালে আবার আসবে।

পুলিশ তো চোর-ডাকাতদের ধরতে আসে, আমি কি তাই ?

ধরতে আসবে না। ঘটনাটা কী ঘটেছিল, জানতে আসবে।

আমি যে কিছুই জানি না!

আপনার সঙ্গে এক বন্ধু ছিল, তারও গুলি লেগেছে।

সঙ্গে সঙ্গে রবির কথা তার মনে পড়ল।

আঁতকে উঠে সে বলল, রবি, রবি, তার কী হয়েছে ? সে মরে গেছে ?

না, গুলি লেগেছে তাঁর পায়ে।

অন্য পা-টাও খোঁড়া হয়ে গেছে ?

না। সেই পাতেই গুলি লেগেছে। মানে একই পায়ে। উনি নিচের একটি ঘরে আছেন।

তুমি কে ? তুমি কি নার্স ?

কিছুটা ট্রেনিং নিয়েছি। আমাদের এখানে একজনই মাত্র ট্রেইনড নার্স আছে। দরকার হলে আমরা দু'জন কাজ চালিয়ে দিই।

আমি একবার উঠব। বাইরে যাব।

আপনার এখনো বিছানা থেকে নামা নিষেধ। সেই জন্যই তো আমি এখানে রয়েছি। আপনার কী দরকার বলুন।

আঃ, কী মুস্কিল, আমাকে একবার বাইরে যেতে হবে।

না, যেতে হবে না। শুয়ে থাকুন, আমি ব্যবস্থা করছি।

সে একটা বেড প্যান বার করল খাটের তলা থেকে। অতনুর গা থেকে চাদরটা সরিয়ে নিল। নিম্নাঙ্গে শুধু একটা কাপড় জড়ানো। সেটাও সরিয়ে বেড প্যান রাখল দুই উরুর মাঝখানে।

তারপর সেই অনিন্দ্য সুন্দর রমণী অতনুর পুরুষাঙ্গ ছুঁয়ে সেটিকে ঠিক জায়গায় স্থাপন করল।

শেষ হয়ে গেলে অতনু বলল, আঃ! এবার আমি ঘুমোই ?

তাকে শুইয়ে দিয়ে আবার গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে দিল দীধিতি।

পরদিন সকালে অতনু অনেকটা স্বাভাবিক। তবু আজও তার বিছানা থেকে নামা নিষেধ। ব্লাড প্রেশার অনেক নেমে গেছে।

বিছানাতেই বালিশে হেলান দিয়ে বসে নিজে নিজে দাঁত মাজল অতনু। ঘরে এখন দুটি মেয়ে উপস্থিত। দুজনেরই সে নাম ভুলে গেছে, কাল রাতে কে তাকে পাহারা দিয়েছে, তাও মনে নেই।

একটু পরে সে ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার। সহাস্য মুখে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন, মিস্টার হালদার ?

মানুষের স্মৃতি দুর্বল হয়ে গেলেও ব্যথা বোধ ঠিকই থাকে। সে বলল, এই দিকটায় বেশ ব্যথা।

ডাক্তার বললেন, কমে যাবে। আপনার রিমার্কেবল তাড়াতাড়ি উন্নতি হচ্ছে। আর দু'দিনের মধ্যে আপনি ফিট হয়ে যাবেন।

আমার সব সময় এত ঘুম পায় কেন ?

আপনাকে কিছুটা সিডেটিভ দেওয়া হচ্ছে। ব্যথা কমাবার সেটাই তো উপায়। ঘুমোনোও তো ভালোই।

ডাক্তার মেয়ে দুটির সঙ্গে কীসব আলোচনা করতে লাগলেন।

একটু পরে শোনা গেল ঘণ্টাধ্বনি।

অতনু জিজ্ঞেস করল, ও কিসের আওয়াজ ?

দীধিতি বলল, আমাদের আশ্রমে পুজো শুরু হয়েছে।

আশ্রম ? কিসের আশ্রম ?

বেদান্ত সঙ্ঘের আশ্রম। আপনি তো আগে এসেছেন এখানে

আগে এসেছি ? কই না তো। আমি কোনো আশ্রমের কথা জানি না।

হ্যাঁ, আপনি এসেছেন। একদিন সকালে... আমি আপনাকে দেখেছি। আপনার মনে নেই ?

না। আমি কবে আশ্রম দেখলাম ?

তখনই রবিকে ধরে ধরে নিয়ে এলো একজন সঙ্গী। রবির সারা শরীরে কোনো ক্ষত চিহ্ন নেই, শুধু তার এক পায়ে প্লাস্টার।

রবি বলল, কেমন আছিস, অতনু ?

অতনু বলল, হুঁ! কেমন আছি ? কে জানে! তোর গায়েও গুলি লেগেছে ?

রবি কাছে এগিয়ে বলল, হ্যাঁ, লেগেছে, পায়ে। আগের রাতে যা শুনেছে, তা মনে নেই অতনুর। সে বলল, তোর দুটো পা-ই গেল! তুই হাঁটবি কী করে ?

রবি বলল, সৌভাগ্যের বিষয়, আমার খোঁড়া পা-টাতেই গুলি লেগেছে। আমি তখন টের পাই নি, আমি তখন তোর জন্য... আমি তো জ্ঞান হারাই নি, তোকে দেখে এত ভয় হচ্ছিল, গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। ওরা চলে যাবার পরই আমি ছুটে বাইরে গেলাম।

ওরা মানে কারা ?

টাকা-পয়সা কিছু নেয় নি। কোনো পলিটিক্যাল পার্টির ক্যাডার। তোর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হতেই গুলি চালিয়ে দিল।

আমরা তো গুলি করি নি।

আমরা গুলি করব কী করে! আমাদের সঙ্গে কি বন্দুক-পিস্তল কিছু ছিল ? আমরা তো ভাবতেই পারি নি, অমনভাবে বাড়ির মধ্যে ঢুকে—

অতনুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে রবি আড়চোখে দেখছে দীধিতিকে। এই সেই আশ্রমকন্যা শকুন্তলা। কাছ থেকে দেখে মনে হচ্ছে, এর জন্যে কোনো কোনো পুরুষ তো পাগল হতেই পারে। শেষ পর্যন্ত তাহলে, অন্যরকম অবস্থায়, অতনুর কথাটা মিলে গেল, আলাপ হলো এর সঙ্গেই।

কিন্তু অতনু যে মেয়েটির কথা একেবারেই ভুলে গেছে, তা সে জানে না।

পুলিশ আসবার পর সব কিছু উত্তর দিতে হলো রবিকেই। অতনুর উত্তর অসংলগ্ন। সে মন দিয়ে শুনতে লাগল রবির কথা, যেন একটা অচেনা কাহিনী। এখানে একটা বাড়ি কেনা হয়েছে ? কেন ? বাড়ি দিয়ে কী হবে ? আততায়ীদের ধরা যায় নি, তারা পালিয়ে গেছে গভীর জঙ্গলে। পুলিশ খুঁজছে। ওসমান সাহেব কারোকেই চেনেন না বলেছেন। কে ওসমান ?

বিকেলের দিকেও ডাক্তারটি দেখতে এলেন আবার।

অতনুর কথাবার্তা যে অসংলগ্ন, তা জেনেও গুরুত্ব দিলেন না তিনি। তিনি শল্যচিকিৎক, তাঁর অপারেশান সার্থক হয়েছে, এতেই তিনি তৃপ্ত। মনস্তত্ত্ব নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। আকস্মিক শকে এরকম হতেও পারে, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।

আজ রাতেও অতনুকে একবার বেডপ্যান দিতে হলো। আজ অবশ্য দীধিতি নয়, অন্য মেয়েটি রয়েছে পাহারায়।

পরদিন, সারাদিন দীধিতিকে আর দেখাই গেল না।

অনুপমা আর একজন পুরুষসঙ্গী মিলে একবার অতনুকে খাট থেকে নামিয়ে হাঁটাতে হলো কয়েক পা। হাঁটতে তার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। পায়ে জোর আছে, ঘুম ঘুম ভাবটাও কেটে গেছে। এখনো অবশ্য সে বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসবার অনুমতি পায় নি।

আজ একজন পরিপূর্ণ পোশাক পরা নার্স এলো শেষ বিকেলে। এই আশ্রমের যিনি গুরুমা, তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর কাছেই এই ট্রেইনড নার্সটিকে সর্বক্ষণ থাকতে হয়। এক ফাঁকে এসে সে অভিজ্ঞ হাতে অতনুর সারা শরীর নগ্ন করে গরম জলে স্পঞ্জ করে দিল। বুকের ব্যান্ডেজটাও খুলে দেখা গেল, তার রক্ত বেরোচ্ছে না। ক্ষত সেরে এসেছে অনেকটা।

অতনু জিজ্ঞেস করল, আমি কবে এখান থেকে ছাড়া পাব ?

নার্সটি অধিকাংশ কথাই ইংরেজিতে বলে। সে বলল, হোপ ফুলি ইন অ্যানাদার থ্রি ডেইজ। তারপর ইউ ইউল বি ফ্রি।

অতনু জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাব ?

নার্সটি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, আপনি কোথায় যাবেন, হাউ কুড আই পসিবলি নো ? আপনার নিজের বাড়িতে যাবেন।

অতনু জিজ্ঞেস করল, আমার নিজের বাড়িটা কোথায় ? আমি যদি মরে যেতাম, তাহলে কি আমার নিজের কোনো বাড়ি থাকত ?

নার্সটি দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আই হ্যাভ নো আনসার!

সন্ধের দিকে অতনুর এমনই মন খারাপ হয়ে গেল যে রবি দেখা করতে এলেও সে ভালো করে কথা বলল না।

অনুপমা তাকে গলা ভাত আর মুরগির স্টু খাওয়াতে নিয়ে এলো, সে মুখ সরিয়ে নিল একটু পরেই।

তাকে ধমক দিয়ে বলল, আমাকে একটা সিগারেট দিতে পারো না ?

অনুপমা বলল, হাসপাতালে তো সিগারেট পাবেনই না। এখান থেকে বেরিয়েও আর সিগারেট খাবেন না।

মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়ল অতনু। রাতে কে তার ঘরে রইল, তা সে লক্ষও করল না। কোনো সাহায্যও চাইল না, যদিও ঘুম ভেঙে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

রবির কাছ থেকে কাহিনীটা শোনার পর এখন সে মাঝে মাঝেই দেখতে পাচ্ছে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একজন লম্বা চেহারার লোক রিভলভার থেকে গুলি করছে তার দিকে। দৃশ্যটা চোখে ভেসে ওঠা মাত্র তার মনে হচ্ছে, সে মরে যাচ্ছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর।

দীধিতি আবার এলো পরদিন সন্ধের পর।

তার দিকে কয়েক পলক এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে সে রীতিমতন প্রখর গলায় জিজ্ঞেস করল, তুমি দুদিন আসো নি কেন ?

দীধিতি বলল, আমি যে দুদিন আসি নি, তা আপনি খেয়াল করেছেন ?

রূপের মতনই মেয়েটির গলার আওয়াজও খুব মিষ্টি। ভদ্রতা আর বিনয়ের ভাবও আছে।

আবার সে বলল, আমাদের গুরুমা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আমি তাঁর কাছে ছিলাম। একটু আগে তিনি কোলকাতায় ফিরে গেলেন।

তুমি আমাকে একটু ধরবে ? একবার বাথরুমে যাব।

আজ না, কাল থেকে। এখন কিছু লাগবে ?

ঠিক আছে, এক্ষুনি না। তুমি আগের দিন যে আমাকে ঐ ব্যাপারে সাহায্য করলে, তখন কিছু বোধ করি নি। এখন একটু একটু লজ্জা করছে। আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি যে রোগীদের জন্য ঐসব কর, তোমার ঘেন্না করে না ?

না, ঘেন্না করে না। এ তো মানুষের সেবা। আর মানুষের সেবা মানেই ঈশ্বরের সেবা।

ঈশ্বর কে ? তোমাদের এখানকার কোনো বড়বাবু ?

কী বলছেন আপনি ? ঈশ্বর তো সব মানুষেরই।

আমার নয়। আমার কোনো ঈশ্বর-টিশ্বর নেই। শোনো, আমি অতনু হালদার, আমি বিচ্ছিরি ধরনের নাস্তিক। আমার বন্ধুরা আমাকে বলে শয়তান, কালাপাহাড় কিন্তু আমি একটা এগজাম্পল সেট করছি। ছোটবেলা থেকেই আমি কোনো ধর্ম মানি না, ভগবান মানি না। কোনোদিন প্রার্থনা, ট্রার্থনা করি নি। তবু, আমি দেখাতে চাই, এইভাবেও সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়। ধর্ম নিয়ে মাতামাতি না করেও মানুষ আনন্দের সঙ্গে বাঁচতে পারে।

আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন। তবে, আপনি যে জীবনযাপনের কথা বলছেন, তার সঙ্গে যদি এই সৃষ্টির বিস্ময়, কোনো গভীর অনুভূতি, যিনি এই বিশ্ব সংসার সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কাছে পৌঁছোনোর পথ খোঁজা, এইসব করলে নিশ্চিত জীবনযাপনের আনন্দ আরো অনেক বিশুদ্ধ হতো। মনটাকে সব গ্লানি থেকে মুক্ত করা যেত।

মাথা নেড়ে অতনু বলল, না। আমি অনেক ধর্ম আশ্রিত, ভক্তি আশ্রিত মানুষ দেখেছি, তাদের কোয়ালিটি অফ লাইফ মোটেই আমার চেয়ে ভালো না। দেখেছি, তাদের লোভ আছে, ঈর্ষা আছে, মিথ্যে কথা বলে। কিন্তু আমি মিথ্যে বলি না, আমি কোনো মানুষের ক্ষতি করি না। পারলে যথাসম্ভব অন্যের উপকার করি। আমি ধর্মের বইগুলো ঘেঁটে দেখেছি। সবকটা ধর্মই বেশ কাঁচা ধরনের ছেলে ভুলোনো রূপকথা। কোনো শিক্ষিত, সিভিলাইজড অ্যাডাল্ট লোকের কাছে ধর্মের কোনো প্রয়োজনীয়তাই নেই।

একসঙ্গে এতগুলি কথা বলে হাঁপাতে লাগল অতনু। এখন মাঝে মাঝে ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটাও নেই।

দীধিতি মৃদু গলায় বলল, আপনার এই যে নাস্তিকতার তীব্রতা, তারও একটা গুণ আছে। নিশ্চয়ই দেখবেন, এইভাবে যুক্তি দিতে দিতে আপনি হঠাৎ একদিন বিশ্বাসের দরোজায় পৌঁছে গেছেন। তখন আপনার বিশ্বাসও এই রকমই তীব্র হবে।

অতনু হেসে বলল, সেইরকম দিন কখনো আসবে না। এলেও তুমি তা জানতে পারবে না।

দীধিতি বলল, এখন একবার ব্লাড প্রেসারটা দেখে নিই ? এখনো প্রেসারটা ফ্লাকচুয়েট করছে।

অতনুর বাহুতে পট্টি বাঁধতে লাগল দীধিতি। অতনু জিজ্ঞেস করল, তোমার কোনো ডাক নাম নেই ?

ছিল একটা। সেটা বলতে এখন আমার লজ্জা করে।

কী শুনি, শুনি। তোমার নামটা বড্ড খটোমটো।

পরী।

বাহ্! এটা তো বেশ মানানসই নাম! তবে আমার একটা ভুল হয়ে গেছে। প্রথম থেকে তোমাকে তুমি বলছি। তখন তো ঘোরের মধ্যে ছিলাম। আপনি বলাই উচিত ছিল, যদিও আমি বয়েসে বড়, তবু, এখন থেকে আপনিই বলব।

দীধিতি হেসে বলল, একবার যখন তুমি বলেই ফেলেছেন, আর কী করা যাবে! আর আপনি করার দরকার নেই।

তাহলে তুমিও কি আমাকে নাম ধরে তুমি বলতে পারবে ?

আমরা তো কারোর নাম ধরি না। সব পুরুষকেই বলি প্রভু!

প্রভু ? নারীবাদীরা শুনতে পেলে তোমাদের পিণ্ডি চটকাবে। প্রভু মানে তো মালিক, আর তোমরা তাহলে দাসী ?

দাসী হতে আমাদের আপত্তি নেই। সব পুরুষই তো পরম ব্রহ্মের অংশ, সেই হিসেবে তাঁদের সেবা করা।

পুরুষরা পরম ব্রহ্মের অংশ, আর মেয়েরা কি বানের জলে ভেসে এসেছে ? এসব ধর্মীয় ন্যাকাপনা শুনলেই আমার রাগ হয়। তোমরা মেয়েরা যে এত ধর্মকর্ম করো, তোমরা জানো না যে সব ধর্মেই মেয়েদের ছোট করে দেখা হয়েছে ? সব ধর্মই পুরুষতান্ত্রিক। যে-সব ধর্মে ঈশ্বর নিরাকার, তারাও সর্বনামে বলে হি অর্থাৎ নিরাকার হলেও পুরুষ। ইট তো বলে না। নিরাকারের তো নিউটার জেন্ডার হওয়া উচিত।

আমি আমার নিজের ধর্ম মানি। আপনি অত উত্তেজিত হবেন না। প্রেশার নিচ্ছি। ভুল হয়ে যাচ্ছে, আবার নিচ্ছি!

অতনু সত্যিই উত্তেজিত হয়েছে। শুধু মস্তিষ্কে নয়, শরীরেও। সে টের পাচ্ছে, কেউটে সাপের ফণার মতন আস্তে আস্তে উঁচু হচ্ছে তার পুরুষাঙ্গ। বেশ কয়েকদিন পরে এই প্রথম।

তার খুব কাছেই এই রমণীর শরীর। সাধারণ লাল পাড়, সাদা শাড়ি পরা, কোনোরকম প্রসাধন কিংবা অলংকার নেই, তবু অপূর্ব রূপের বিভা। ওর নামের অর্থ দীপ্তি, সত্যিই যেন দীপ্তি টের পাওয়া যায়।

এক হাতে ব্যান্ডেজ, অন্য হাতে এখন পট্টি বাঁধা। তবু একবার ওকে স্পর্শ করার জন্য অতনুর মনটা আকুলি বিকুলি করতে লাগল।

প্রেসার দেখা শেষ হয়েছে, পরীর কপালে চিন্তার রেখা। পট্টিটা খুলে নেওয়া মাত্র অতনু ওর মাথায় হাত রাখল।

আয়ত চোখ দুটি অতনুর মুখে ন্যস্ত করে পরী জিজ্ঞেস করল। এ কী করছেন ?

অতনু বলল, তুমি এত সুন্দর, তাই তোমাকে একটু ছুঁয়ে দেখছি।

সব মানুষই সুন্দর। যে দেখছে তার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর অনেকটা নির্ভর করে।

তা জানি। তবু রূপের একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে। সব স্ট্যান্ডার্ডেই তুমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।

ওসব বলবেন না। মানুষের চেহারা, রূপ, এই সবই অবান্তর। মানুষের মনটাই তো আসল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, হৃদয়ের কথা কহিতে ব্যাকুল, সুধাইলো না কেহ...।

হৃদয়ের কথা আসল তো বটেই। কিন্তু শরীরও তুচ্ছ করা যায় না। আমি যদি তোমাকে একটু ছুঁতে চাই, সেটা কি অন্যায় ?

ন্যায়-অন্যায়ের কথা আলাদা। প্রশ্ন হচ্ছে কী উদ্দেশ্যে ছোঁওয়া! আমি কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে নিয়েছি। সেই জন্যই আপনাকে ছুঁতে তো আমার কোনো অসুবিধে হয় না।

আমি অবশ্য বাসনা বদ্ধ জীব। আজই প্রথম তোমাকে আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

হাতটা সে মাথা থেকে সরিয়ে এনে পরীর নবনীত-তুল্য গালে রাখল। করুণ গলায় পরী বলল, ওরকম করবেন না প্লিজ!

নিজেকে সে সরিয়ে নিল একটু দূরে। অতনুর হাতের সীমার বাইরে।

অতনু বলল, তোমার মুখ-চোখে সত্যিই একটা পবিত্রতার ভাব আছে। হয়তো আমার এ ধরনের ব্যবহার ঠিক নয়। তোমার সঙ্গে কথা বলতেও ভালো লাগে। ঠিক আছে, কিন্তু আমাকে যে একবার উঠতেই হবে।

কেন ?

একবার বাথরুমে যাওয়া খুবই দরকার।

আজ নয়। প্রেসারের যা অবস্থা, হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারেন, আমি বেড প্যান দিচ্ছি।

না, না। আজ আমি তোমার কাছ থেকে বেডপ্যান নিতে পারব না। আমি যেতে পারব বাথরুমে।

আমি বেডপ্যান দিলে কী হয়েছে, আগেও তো দিয়েছি।

আজ আমার লজ্জা করছে। আমি আস্তে আস্তে হেঁটে যাব। মাথা ঘুরবে না।

চুপটি করে শুয়ে থাকুন। এতে লজ্জার কী আছে!

সে বেডপ্যানটা বার করে আনল। অতনুর গা থেকে কম্বল আর নিম্নাঙ্গের কাপড়টা সরিয়ে ফেলতেই দেখতে পেল এক উত্থিত, দৃঢ় দণ্ড। কয়েক মুহূর্ত মাত্র সেদিকে তাকিয়ে রইল পরী, লজ্জারুন হয়ে গেল তার মুখ।

তারপর দ্বিধা না করে বেডপ্যানটি যথাস্থানে স্থাপন করে সেই দণ্ডটি ছুঁল।

চোখ বন্ধ করে রইল অতনু।

কাজ হয়ে যাবার পর বেডপ্যানটি নিয়ে বেরিয়ে গেল পরী। আর ফিরে এলো না।

রাত্তিরেও ঘরে এলো না কেউ।

পরদিন সকালে এলো অন্য মেয়েটি। সারাদিনেও সে আর এ ঘরমুখো হলো না। অতনু তার জন্য মনে মনে অপেক্ষা করছে বটে, কিন্তু আগের দিন সন্ধেবেলা ঠিক কী হয়েছিল, তা এর মধ্যেই অস্পষ্ট হয়ে গেছে তার স্মৃতিতে।

আজ আবার তার কথাবার্তা অসংলগ্ন।

ডাক্তার দেখতে এসে বললেন, আর একটি দিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তার পরেই অতনুর ছুটি। প্রেসারটা স্টেডি না হলে তাকে ছেড়ে দেওয়ার ঝুঁকি আছে। ওষুধ বদলে দেওয়া হয়েছে, আশা করি এবার ঠিক হয়ে যাবে।

অতনু ভাবল, ছুটি ? তার মানে কী ? এরপর সে কোথায় যাবে ? এই নরম বিছানায় শুয়ে থাকাটাই তার ছুটি নয় ?

কোলকাতার বাড়ি, নিজের স্ত্রী, সংসার, ব্যবসার কথা তার মনে পড়ছে না।

ওসমান সাহেব এলেন দেখা করতে।

অতনুর মনে হলো, এই লোকটিকে কোথায় যেন আগে দেখেছে। মুখটা চেনা চেনা, নাম মনে পড়ছে না। কী একটা যেন বাড়ির কথা বলছে, কার বাড়ি ?

রবিকে ঠিকই মনে আছে। সে রবিকে বলল, একটা সিগারেট খাওয়াতে পারিস না ?

তার উত্তরে রবি বলল, এখানে এরা চিকিৎসার জন্য পয়সা নেয় না। কিন্তু কিছু ডোনেশান দেওয়া উচিত। তোর ব্যাগে হাজার পাঁচেক ছিল, আর পাঁচ হাজার আমি ওসমান সাহেবের কাছ থেকে ধার নিচ্ছি। ঠিক আছে ?

ঘরে যখন কেউ নেই, সে আস্তে আস্তে নামল খাট থেকে।

বুকের বড় ব্যান্ডেজটা খুলে দিয়ে ছোট করে ব্যান্ডেজ বেঁধেছে। শুধু স্লিং বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে একটা হাত।

পা টিপে টিপে সে গেল বাথরুমের দিকে। মাথাটা টলটল করছে ঠিকই। দেয়াল ধরে ধরে গিয়ে সে সংলগ্ন বাথরুমের দরজা খুলল।

অন্যের সাহায্য ছাড়াই সে বাথরুম ব্যবহার করতে পারছে। এটাই তো সুস্থতার লক্ষণ। কিন্তু মাথাটা পরিষ্কার হচ্ছে না কিছুতেই। এখান থেকে বেরিয়ে সে কোথায় যাবে, কিছুতেই মনে করতে পারছে না। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একজন আচমকা রিভলভার বার করে গুলি চালাল। এরকম সরাসরি গুলি খেয়ে কেউ বাঁচে ? সে বেঁচে আছে। তারপর ?

মাথাটা ঝাঁকিয়ে সে তারপরে কী হবে, সে বোঝার চেষ্টা করে।

নিজে নিজেই সে ফিরে এলো বিছানায়।

দুপুরের খাবার নিয়ে আসে যে মেয়েটি, সে পরী নয়, তার নাম অতনুর মনে নেই। এ মেয়েটিও মোটেই অসুন্দর নয়। কিন্তু একে দেখে অতনুর কোনো চিত্ত-বিকার হয় না।

সে খাবারের সঙ্গে নিয়ে এসেছে খবরের কাগজ। জিজ্ঞেস করল, আপনি কোনো বই-টই পড়বেন ? আমাদের লাইব্রেরি আছে। এনে দিতে পারি ?

ছোটবেলা থেকেই অতনু প্রচুর বই পড়ে। বাংলা ও ইংরেজি। কিন্তু কোন বই আনতে বলবে ? একজনও লেখকের নাম মনে নেই।

সে খবরের কাগজটার ওপর চাপড় মেরে ইঙ্গিতে জানাল, এটাই যথেষ্ট।

আজ তাকে ভাত, ডাল ও পনিরের তরকারি দেওয়া হয়েছে। সে নিজেই চামচে করে দিব্যি খেতে লাগল। মেয়েটি বলল, এই তো বেশ খিদে হয়েছে, এবার আপনি চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। ছুটির সময় হেঁটেই নামতে পারবেন সিঁড়ি দিকে।

অতনু বলল, ছুটি ? আমি যদি এখান থেকে আর না যাই ?

মেয়েটি হেসে বলল, বা বেশ তো। থাকুন না। আমাদের বুঝি পছন্দ হয়েছে আপনার ? থাকুন, আমাদের আশ্রমের কাজ করবেন। কিন্তু আপনার স্ত্রী কি রাজি হবেন ?

আমার স্ত্রী ?

শুনলাম তো আপনার স্ত্রী এখন জার্মানিতে আছেন। খবর পেলে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন। আপনি ভালো আছেন, তাই তাকে বারণ করা হয়েছে। আপনি তো বেশি কথাই বলতে চান না, কিন্তু রবিবাবু আমাদের সঙ্গে অনেক গল্প করেন।

অতনু নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে উঠল। তার একজন স্ত্রী আছে, অথচ তার মুখ মনে করতে পারছে না। সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? না! পাগলদের মনে কি এই প্রশ্ন জাগে?

খবরের কাগজ পড়তে তার একটুও মন লাগল না। সবই যেন অবান্তর।

তার থেকে ঘুম ভালো। অনেকক্ষণ ঘুমোবার পর সে জাগল ঘণ্টার আওয়াজে। আশ্রমের মন্দিরে আরতি হচ্ছে। সকাল ও সন্ধেবেলা দু'বার। অতনু কোনোদিন কোনো মন্দিরে আরতির সময় উপস্থিত থাকে নি। এখন বাধ্য হয়ে শুনতে হলো ঘণ্টাধ্বনি ও বৃন্দগান। যাদের হৃদয়ে ভক্তি ভাব নেই, তাদের মনে হয় ঐ গানের সুর একঘেয়ে। প্রত্যেক দিন ঐ একই গান শুনে দেবতাদেরও খুশি হওয়ার কথা নয়।

আরতি শেষ হবার পর একজন সেবক এসে প্রত্যেক ঘরে প্রসাদ দিয়ে যায়। আতপচাল কলা দিয়ে মাখা, বাতাসা আর একটা নারকেল নাড়ু। অন্যদিন অতনু কিছুই খায় না। আজ নারকেল নাড়ুটা মুখে দিল।

নাড়ুটাতে সে মা মা গন্ধ পেল। মা প্রায়ই নাড়ু বানাতেন, অতনু ভালোবাসতো খুব। মাকে তার মনে পড়ল, মা যেন বহুদূরের মানুষ। মুখখানা ঝাপসা।

একজন ঘরে ঢুকে বলল, অন্ধকার কেন, আলো জ্বালে নি?

আলো জ্বেলে দিল দীধিতি। তাকে দেখেই তার সম্পর্কে সব কিছু মনে পড়ে গেল অতনুর। আগের দিনের কথাও। দুদিন ও আসে নি বলে তার মনে অভিমানও জমেছে।

সে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন?

তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অতনু বলল, তুমি যে আজ এলে বড়? তোমার তো আর আসার কথা নয়?

কেন, আসার কথা নয় কেন?

আগের দিন তুমি আমার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে চলে গিয়েছিলে!

হ্যাঁ, কেউ আমাকে ডেকেছিল। আজ এলাম, আপনি তো চলে যাবেন, দু'একদিনের মধ্যে আর যদি দেখা না হয়। তাই বিদায় নিতে এলাম। আশ্রমের কাজে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়।

সত্যি কথা বলো তো, পরী। সেদিন তুমি আমার ব্যবহারে ভয় পেয়েছিলে?

একটু ভয় পেয়েছিলাম, তা সত্যি।

তবু আবার এলে?

কাল সারাদিন ভাবলাম, এই ভয় পাওয়াটা আমার দুর্বলতা। এটাকে জয় করতে না পারলে তো কোনো কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়।

কেমন ভয়কে জয় করেছ দেখি? কাছে এসো। তোমার হাতটা আমাকে ধরতে দাও।

খাটের কাছে এসে, ঠোঁট টিপে হেসে সে বলল, আপনি ধরবেন, না আমি আপনার হাত ধরব। আপনার পাল্‌স বিট চেক করব।

ওসব এখন থাক। তোমাকে দেখে আমার বুক কাঁপছে। সম্পূর্ণ আশ্রমবিরোধী এক চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছে। তোমাকে এখন একটু আদর করলে কি তোমার ধর্ম-নাশ হবে? ধর্ম কি এত ঠুনকো!

আমার ধর্ম-নাশের কথা বাদ দিচ্ছি। কিন্তু ওসব করে আপনার কী হবে?

আমার ডেফিনেটলি শারীরিক সুখ হবে। পৌরুষের তৃপ্তি হবে। আচ্ছা, তুমি যে রোগীদের ঘরে অনেকক্ষণ একলা থাকো, এমনকি রাত্তিরেও থাকো, এর আগে অন্য কেউ তোমাকে ছুঁতে চায় নি? কেউ জোর করে নি?

অতনুর হাতের ওপর নিজের হাত রেখে পরী বলল, চেয়েছে। তারপরেই তারা হতাশ হয়েছে।

তার মানে? হতাশ হয়েছে, কেন?

কারণ আমার শরীরটা যে ঠাণ্ডা। বরফের মতন। আমি যে কামনা-বাসনা মুছে ফেলেছি একেবারে। এ শরীর আর মানুষের জন্য নয়। শুধু আমার আরাধ্য দেবতার জন্য। আপনি মীরা বাঈয়ের কথা শোনেন নি? তাঁর সঙ্গে নিজের তুলনা করছি না। তিনি মহীয়সী, কিন্তু আমিও তাঁর পথেই চলেছি।

বাজে কথা বলো না। মীরা বাঈয়ের কথা আমি জানি না। কিন্তু প্রত্যেক শরীরেরই একটা যৌবন ধর্ম থাকে। বায়োলজিক্যাল নিয়মেই সে শরীর জাগ্রত হয়। তোমরা সেটা যতই চাপা দেবার চেষ্টা করো, কিন্তু প্রকৃতি তো তার দাবি জানাবেই। প্রকৃতি চায় মিলন।

প্রকৃতিকেও অস্বীকার করা যায়। বিশ্বাস করুন, যায়। আমার গুরুমা কোনো দিন পুরুষ সঙ্গ করেন নি। অথচ ভালো পরিবারে ওঁর জন্ম। উনি তো পেরেছেন।

ওনার কি মেনস্টুরেশান হতো? তোমার হয়? এটাই তো প্রকৃতির ইঙ্গিত। তোমরা জোর করে সেটা আটকাবার চেষ্টা করলে, সেটা খুবই কৃত্রিম ব্যাপার। তার মধ্যে সত্যের গভীরতা কিছু নেই।

আপনি এমন কথা বলেন! আপনার মতন এমন একশ' ভাগ নাস্তিক আমি আগে কখনো দেখি নি। আমাদের চেনাজানা বৃত্তের মধ্যে এমন মানুষ আসে না। বাপরে বাপ, কী তীব্রভাবে আপনি সব মূল্যবোধ অস্বীকার করেন। এক হিসেবে, আপনি অসাধারণ।

তার কারণ, তোমরা একটা ছোট বৃত্তের মধ্যে থাকো। নিজেদের গুটিয়ে রাখো। কতকগুলো আপ্ত বাক্য মেনে চলো, যুক্তিবোধ দিয়ে বিচার করো না। আমি অসাধারণ কিছু নই, আমি সাধারণ মানুষ। শুধু আমি অন্য কারোর নির্দেশ ধার করি না, শুধু নিজের বিবেকের নির্দেশে চলি। আমি সামাজিক রীতি-নীতি মানি না। তবে আমারও নিজস্ব একটা নীতি আছে। এমনকি বলতে পারো, আমিও একটা ধর্ম মানি। তার নাম মানব ধর্ম।

আমরা সবাই তো সেই মানব ধর্মই মানি। হয়তো আমাদের পথ আলাদা।

না, তোমরা মানবধর্ম মানো না। মুক্ত চিন্তা ছাড়া মানবধর্ম হয় না। সে ধর্ম মানতে গেলে শারীরিক সুখ, পার্থিব উপভোগ, এসব বাদ দেবার কোনো প্রশ্ন নেই। যেমন আমি মনে করি, একজন নারী ও পুরুষের যদি পারস্পরিক সম্মতি থাকে, তাহলে তাদের মিলনও পবিত্র। আমি কোনোদিন কোনো মেয়ের ওপর জোর করি নি, করবও না। সেই জন্যই আমি তোমাকে এখন জিজ্ঞেস করছি, আমি তোমার হাতটা আমার হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ঘষি, তাতে তোমার আপত্তি আছে?

তাতে কী হবে?

দেখতে চাই, তোমার হাতে উত্তাপ আসে কি না। এখন বেশ কিছুক্ষণ এ ঘরে আসবে না কেউ।

না, প্লিজ, ওসবের দরকার নেই।

একটা সামান্য এক্সপেরিমেন্টে তোমার ভয়? তুমি বললে, তোমার শরীর হিম-শীতল হয়ে গেছে। আমি মিলিয়ে দেখব, সেটা সত্যি কিনা। তুমি ভয় পাবে কেন?

না, আমি ভয় পাই না।

পরীর কুসুম-কোমল হাতখানিতে অতনু নিজের হাতটা ঘষতে লাগল। বেশিক্ষণ নয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই হাতে এলো তাপ। এই তাপ লুকিয়ে ছিল তার শরীরেই, এখন আত্মপ্রকাশ না করে পারল না।

শুধু তাই-ই নয়, পরীর দু'গালে লাগল রাঙা ছোপ, স্ফীত হলো ওষ্ঠাধর। কপালে খুব সূক্ষ্ম ঘামের বিন্দু।

অতনু বলল, দেখেছ, প্রকৃতির দাবি কত জোরালো?

ধরা গলায় পরী বলল, আমি এখন যাই।

অতনু ঘাড় হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ, যেতে পারো।

পরী এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

অতনু বলল, এখান থেকে বেরিয়েই কারোর সামনে যেও না। কিছুক্ষণ একা থেকো। এখন তোমার মুখ চোখ দেখলে যে-কেউ চমকে উঠবে, হয়তো ভাববে, কেউ তোমার ওপর অত্যাচার করেছে।

দৌড়ে আবার খাটের কাছে ফিরে এসে কান্নাভরা গলায় পরী বলল, এ আপনি আমার কী করলেন? আমার সারা শরীর কাঁপছে।

তার থুতনিটা তুলে ধরে অতনু বলল, আমি মাটির মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছি। এখন যে তোমাকে আরো কত সুন্দর দেখাচ্ছে, তা তুমি জানো না।

থুতনিটা ছেড়ে দিয়ে অতনু খাট থেকে নামার চেষ্টা করল।

পরী জিজ্ঞেস করলেন, ও কী করছেন? নামছেন কেন?

অতনু বলল, দরজার ছিটকিনিটা বন্ধ করে দিচ্ছি। আমাকে যখন তুমি পরিষ্কার টরিষ্কার করে দাও, তখনো তো দরজা বন্ধই থাকে!

পাঁচ

কোলকাতায় ফিরিয়ে আনার পরও অতনু পুরোপুরি সুস্থ হলো না। ট্রেনে যখন রবি তাকে ফিরিয়ে আনে, তখন সে প্রায় অর্ধ-উন্মাদ। কিছুতেই আশ্রমের হাসপাতাল ছেড়ে আসতে চায় না। বারবার বলতে লাগল, আমি কোথায় যাচ্ছি? কোলকাতায় আমার কে আছে?

নিজের বাড়িতে এসেও সে কোন দিকে সিঁড়ি, বাথরুমের দরজা ভুলে গেছে। চন্দনা তখনো ফেরে নি।

দোতলা বাড়ি, এক পিসি আর পিসতুতো ভাই থাকে। পিসিই সংসার চালান। চন্দনা অতনুর ব্যবসার সক্রিয় অংশীদার, নিয়মিত অফিস করে, কাজের জন্য তাকে বাইরেও যেতে হয়। ব্যবসার মালিকানা তাদের দু'জনের সমান সমান। চন্দনার এক ভাই বসন্তকে ম্যানেজার করা হয়েছে, সে অবশ্য বেতনভোগী।

বুলেটের আঘাতজনিত ক্ষত অংশটা সেরে গেছে। কিন্তু মানসিক বিষয়টা সে কিছুতেই সামলাতে পারছে না। মাঝে মাঝেই সে দেখতে পায়, দরজার কাছে দাঁড়ানো একটা লম্বা লোক রিভলভার তাক করে সোজাসুজি গুলি করছে তাকে। সে মরে যাচ্ছে। এই ছবিটা দেখার পরই তার চিন্তার জগৎ লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। আবার দু'তিনদিন পর সে অনেকটা স্বাভাবিকও হয়ে ওঠে, ঠিকঠাক কথা বলে।

চন্দনা ফেরার আগেই রবি অতনুকে নিয়ে গেল একজন বিশিষ্ট মানসিক-রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে। তিনি অতনুকে পরীক্ষা করলেন তিনদিন ধরে। তারপর রায় দিলেন যে এটা একটা সাইকো সোমাটিক ব্যাপার, তার থেকে ট্রমা হয়। তিনি কিছু ওষুধ দিচ্ছেন বটে, কিন্তু এ রোগের সঠিক কোনো চিকিৎসা নেই। শুধু সময়ের অপেক্ষা। মাঝে মাঝে যে সুস্থ হয়ে ওঠে, সেটাই আশার লক্ষণ।

মহুলডেরার কথা একেবারেই ভুলে গেছে অতনু। সেখানকার বাড়িটার প্রসঙ্গ উঠলেই সে চোখ কুঁচকে থাকে। মহুলডেরা কী, কোথায়, কেন সেখানে বাড়ি কেনা হয়েছিল?

চেক সই করতে বললে, সে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। বারবার তাকে তার নামটা মনে করিয়ে দিতে হয়। দেখানো হয় তার আগেকার সই। তারপর অবশ্য সে ঠিকঠাক সই করে দেয়, তবে আগেকার মতন সে টাকা তোলার কারণটা খুঁটিয়ে জানতে চায় না।

চন্দনা এসে পৌঁছোবে সামনের শনিবার। গিয়েছিল এক মাসের জন্য, বিয়ে বাড়ি ছাড়াও সে ওদিককার প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে অফিসের প্রচারের কিছু কাজ করে আসবে।

অতনুকে গুলি করার ব্যাপারটা তাকে জানানো হয় নি, বলা হয়েছিল গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট, তাও মারাত্মক কিছু নয়।

চন্দনা সম্পর্কেও অতনুর স্মৃতি খুব দুর্বল, তা বুঝতে পেরে রবি চন্দনার অনেকগুলি ছবি দেখিয়ে দেখিয়ে নানান গল্প বলতে লাগল। ওদের বিয়ের সময় কত মজা হয়েছিল, বিয়ে বাড়িতে শর্ট সার্কিট, হঠাৎ অন্ধকার। তারপর একবার দল বেঁধে সবাই মিলে যাওয়া হয়েছিল কালিম্পং, অক্টোবর মাস, আচমকা একদিন বরফ পড়তে শুরু করল। এরকম কখনো হয় না। অভাবনীয় সেই দৃশ্য, সব সাদা, তার কত ছবি রয়েছে অ্যালবামে। ঘোড়ায় চড়া অতনু আর চন্দনা পাশাপাশি।

চন্দনাকে এয়ারপোর্ট থেকে আনতে গেল রবি আর বসন্ত। অতনুকে আর সেখানে নেওয়া হলো না।

বাড়িতে এসে চন্দনা যখন দেখল, অতনু শয্যাশায়ী নয়, গাড়ির শব্দ শুনে নেমে এসেছে নিচে, তাতেই আশ্বস্ত হলো সে। এর আগে পর্যন্ত সে দুর্ঘটনার গভীরতাটা কতখানি, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি।

ঘণ্টাখানেক পর, চা-টা খেয়ে, শয়নকক্ষে এসে স্বামীর সঙ্গে নিভৃতে মুখোমুখি হয়ে সে জানাল তার নিজেরই একটা দুর্ঘটনার কথা।

এই দম্পতির এখনো সন্তান হয় নি। বিয়ে হয়েছে আট বছর। এর মধ্যে মিস ক্যারেজ হয়ে গেছে দু'বার। এবারে বার্লিন যাত্রার সময়ও চন্দনা গর্ভবতী ছিল চার মাসের, দুজন ডাক্তার ভরসা দিয়েছিলেন, এবারে গণ্ডগোলের কোনো সম্ভাবনাই নেই, দুই ডাক্তারই বলেছিলেন। তার বিদেশে ঘুরে আসাও কোনো বাধা নেই। এরকম অনেকেই যায়!

তবু এবারেও গর্ভপাত হয়ে গেল ওখানে থাকার সময়ই।

বলতে বলতে কান্না এসে গেল চন্দনার। অতনুর হাত জড়িয়ে ধরে সে বলল, তোমাকে ওখান থেকে এখবর জানাই নি। একেই তো তুমি নিজে অসুস্থ, এটা শুনলে আঘাত পাবে... আমাদের কী হলো বলো তো? এরপর কি আর কখনো...

অতনুর আঘাত পাবার কথা, কিন্তু তার মুখ ভাব লেশহীন। অবশ্য শোকে-দুঃখে তো মানুষ পাথরও হয়ে যায়। নীরবে বসে থাকে।

অতনুর কোলে মুখ গুঁজে চন্দনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, অতনু হাত বুলিয়ে দিল তার মাথায়।

জার্মানিতে রক্তক্ষরণের পর চন্দনাকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল মাত্র দুদিন। তারপর স্বাভাবিকভাবে ঘোরাফেরা করেছে। কিন্তু ফিরে এসে বেশ দুর্বল হয়ে পড়ল, নিজেই সে শয্যাশায়ী রইল চারদিন।

অতনুর ব্যবহার যে স্বাভাবিক নয়, তা বুঝতে চন্দনার একদিনও সময় লাগে নি। সে চলাফেরা করতে পারে, ঠিকমতন খায় দায়, অথচ বাড়ি থেকে বেরোয় না। অফিসেও যায় না। সারাদিনই প্রায় চুপ করে থাকে।

দুজনেই অফিসে না গেলে ব্যবসা চলবে কী করে? ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসায় যেমন প্রতিযোগিতা, তেমনি একটি দিনের জন্যও রাশ আলগা করা যায় না। একটু সুযোগ পেলেই অন্য কোম্পানি তাদের ক্লায়েন্ট ভাঙিয়ে নেবে।

চারদিনের মধ্যে জেট ল্যাগ ও বিষাদ কাটিয়ে উঠে নিজেকে তৈরি করে নিল চন্দনা।

পঞ্চম দিন সকালে উঠেই সে অতনুকে জিজ্ঞেস করল, তুমি আমার সঙ্গে আজ অফিস যাবে?

অতনু মাথা নেড়ে বলল, না। আমার জ্বর হয়েছে।

চন্দনা কাছে এসে তার কপালে হাত দিয়ে দেখল, কোনো তাপ নেই।

সে বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে। একটা অ্যাসপিরিন খেয়ে নিও!

সেদিন সে যথাসময়ে অফিসে গিয়ে ফিরল সাতটার পর।

দোতলার বারান্দায় আলো না জ্বেলে একটা ইজি চেয়ারে চুপ করে বসে আছে অতনু। শীত পড়ে গেছে, তবু গায়ের চাদরটা লুটোচ্ছে মাটিতে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তার মুখোমুখি বসে পড়ে চন্দনা জিজ্ঞেস করল, তোমার গাড়ির অ্যাকসিডেন্টের গল্পটা বানানো, তাই না?

অতনু আলগাভাবে বলল, গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট?

চন্দনা বলল, তোমাকে উগ্রপন্থীরা গুলি করেছিল?

অতনু এবার বেশ খানিকটা গলা চড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একজন লম্বামতন লোক আমাকে সোজাসুজি গুলি করেছে। আমি মরে গিয়েছিলাম, আবার বেঁচে উঠেছি।

চন্দনার গায়েই যেন গুলি লেগেছে, এইভাবেই সে বলল, ও, ও, কী সাজ্ঘাতিক ব্যাপার। তোমার ঐ বন্ধুটা, রবি, গাদাগাদা মিথ্যে কথা বলে। আমাকে কিছু জানায় নি। আমি ভেবেছিলাম, গাড়ির অ্যাকডিসেন্টে তোমার মাথায় চোট লেগেছিল। তাই এরকম হয়েছে। এ তো আরো সিরিয়াস! কোথায় গুলি লেগেছিল? স্পাইনাল কডে?

না। বুকে।

বুকে? ও মা, এখনো ব্যথা আছে?

ব্যথা আছে।

পরদিনই চন্দনা দুজন স্পেশালিস্ট ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেলল। সে বিয়ের আগে থেকেই স্বাবলম্বিনী ধরনের নারী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও অতনু ছিল বুদ্ধিজীবী, সে যতটা বাক্যবাগিশ, ততটা কার্যে উদ্যোগী নয়। চন্দনা একা সব কাজের ভার নিতে পারে, নিজেই যে-কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

অনেক খরচ করে ডাক্তার দেখিয়েও উপকার হলো না বিশেষ কিছুই। তবু এই ধরনের পরিবারে চিকিৎসার জন্য টাকা খরচ করা একটা বড় ব্যাপার। আত্মীয়-বন্ধুরা বুঝবে যে, অবহেলা করা হয় নি।

চন্দনা একদিন বলল, আমার একটা কথা শুনবে, অতনু?

বলো।

তুমি আমার সঙ্গে একদিন বেলুড় মঠে যাবে? ওষুধপত্রে অনেক সময় কাজ হয় না। কিন্তু উচ্চ মার্গের সাধকদের আশীর্বাদ পেলে অনেক সময় কাজ হয়। এটাকে ফেইথ হিলিং বলো কিংবা যা-ই বলো, কিন্তু কাজ হয়। সত্যি হয়, আমি দু'একজনের ব্যাপার জানি। মাধবানন্দ মহারাজের সঙ্গে আমার চেনা আছে।

অতনু বলল, ফেইথ হিলিং! যার ফেইথ নেই? মঠ, মন্দির, আশ্রম, না, না, ঐসব জায়গায় যেতে আমার ভয় হয়।

ভয় হয়? কেন, ভয় হবে কেন?

যদি আমি গেলে ঐসব জায়গা অপবিত্র হয়ে যায়? আমি একটা খারাপ লোক। চন্দনা, ওসব জায়গায় আমার মতন মানুষদের যেতে নেই।

চন্দনা হেসে বলল, তুমি খারাপ লোক হবে কেন? আজ তো তুমি বেশ ভালোই কথা বলছ। তোমাকে গুলি করার পর তো মহুলডেরার একটা আশ্রমের হাসপাতালেই তোমার চিকিৎসা হয়েছে।

কী জানি। মনে নেই। একটা হাসপাতাল ছিল নিশ্চয়ই।

আমাদের অফিসের সবাই সব জানে, শুধু আমিই জানতাম না। ঐ রবি আমার কিছু বলে না।

রবি কোথায়? সে আর আসে না কেন?

কী জানি। যা বাউণ্ডুলে স্বভাব। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। লক্ষ্মীটি, আমার সঙ্গে একবার চলো বেলুড় মঠে। তোমায় কিছু করতে হবে না, তুমি চুপ করে বসে থাকবে।

না।

ঠিক আছে, আমি একলাই যাব। তোমার হয়ে আমি আশীর্বাদ নিয়ে আসব। শোনো, আর একটা কথা। মহুলডেরার বাড়িটা নিয়ে কী করা যায় বলো তো? শুধু শুধু বাড়িটা পড়ে থাকবে?

বাড়ি? বিশ্বাস করো, সে বাড়ির কথা আমার একেবারেই মনে নেই।

অথচ সেই বাড়িতেই তোমাকে গুলি করা হয়েছিল। আশ্চর্য! মনে পড়বে, ঠিক আস্তে আস্তে মনে পড়বে। ডক্তর দেব বলেছেন। ছ'মাস, এক বছরও লাগতে পারে। আজকে ট্রেড উইন্ডের মালহোত্রা আমায় কী বললেন জানো? বললেন, মিসেস হালদার, আপনাদের মাথা খারাপ হয়েছে? ঐ রকম জায়গায় অতগুলো টাকা ইনভেস্ট করতে গেছেন। বিহার-বাংলার বর্ডারে উগ্রপন্থীদের হানা দিন দিন বাড়ছে। ওখানে গেস্ট হাউজ বানালে এখন কে যাবে? লোকে গাড়ি নিয়ে ঐসব জায়গা দিয়ে পাস করতেই ভয় পায়। এখন একমাত্র ভরসা সাউথ বেঙ্গল। মোটামুটি পিস ফুল। আমি বললাম, কিন্তু সাউথ বেঙ্গলে তো পাহাড় নেই, বাঙালিরা পাহাড় ভালোবাসে। উনি বললেন, পাহাড় নেই, কিন্তু সুন্দরবন আছে, সমুদ্র আছে। এমনকি শান্তিনিকেতনেও একটা কিছু করা যায়। ওখানে এখন অনেক লোক যাচ্ছে। সত্যি, মহুলডেরায় আমাদের সাড়ে চার লাখ টাকা ইনভেস্টমেন্ট কি জলে যাবে? এতগুলো টাকা, সামলাবো কী করে?

এতগুলো কথা বোধহয় মন নিয়ে শুনলোই না অতনু। সে বলল, ডাক্তাররা আমাকে ড্রিংক করতে বারণ করেছেন। তা কি মানতেই হবে? বাড়িতে কিছু রাখো নি?

চন্দনা বলল, অন্তত ছ'মাস বন্ধ। অ্যালকোহলে উল্টো এফেক্ট হতে পারে। বাড়িতে কিছু রাখি নি, দেখছো না, আমিও কিছু খাচ্ছি না।

চন্দনা মাঝে মাঝে অতনুকে সঙ্গ দেবার জন্য ভদকা কিংবা বিয়ার খেয়েছে প্রায় নিয়মিতই। এখন সে-ও সংযম দেখাচ্ছে।

টানা আড়াইমাস অতনুর সেবা-যত্ন এবং মানসিক পরিচর্যা করার পর ধৈর্য হারিয়ে ফেললো চন্দনা।

একজন মানসিক রোগীর সঙ্গে ঘর করা খুবই শক্ত। একটা মানুষ মাঝে মাঝে দু'তিন ঘণ্টা বেশ ভালো ও স্বাভাবিক থাকে, আবার হঠাৎ হঠাৎ পাগলের মতন অসংলগ্ন কথা বলতে শুরু করে, অথবা গুম মেরে থাকে, এরকম দিনের পর দিন সহ্য করা যায় না। এক সময় মনে হয়, পুরোটাই বুঝি অতনুর ভান কিংবা অভিনয়। দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা।

এখন তো আবার সে অনেক বই-টই পড়ছে। পাগলরা কী বই পড়ে! পড়লেও বোঝে?

সংসার আর অফিস, দু'টোই সামলাবে চন্দনা? সে আর পারছে না। শুরু হয়ে গেল খিটিমিটি।

সে এখন জোর করে অতনুকে অফিসে নিয়ে যায়।

দক্ষিণ পার্ক স্ট্রিটে অফিস। মোটামুটি বড়ই, তেইশজন কর্মচারী। স্বামী ও স্ত্রীর আলাদা চেম্বার। অতনু এতদিন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও প্ল্যানিং দেখেছে। বাকি পড়ে গেছে অনেক কাজ। কিন্তু অদ্ভুত এক ক্লান্তি পেয়ে বসেছে অতনুকে। সে শুধু বসে বসে সিগারেট টানে, আর চুপ করে বসে থাকে সামনের দিকে।

মাঝে মাঝে তার মনোজগতে বিরাট তোলপাড় চলে। কী যেন একটা চাপা পড়ে যাচ্ছে ভেতরে, কিছুতেই উপরের দিকে আসছে না। সে তার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দেয়।

আগে অন্যসব কর্মচারীদের সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল বন্ধুর মতন। যে কেউ যখন কাজ আসত তার চেম্বারে। এখন তারা কী যেন বুঝে গেছে, না ডাকলে আসে না কেউ। একমাত্র তার শ্যালক এবং ম্যানেজার বসন্ত ছাড়া। বসন্ত কী সব তাকে বোঝায়, সে হাঁ-হাঁ করে বলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি যা ভালো বোঝো, করো।

বাড়িতে এখন প্রত্যেক দিন ঝগড়া হয় চন্দনার সাথে। অনেকট এক তরফা, চন্দনাই বেশি অভিযোগ করে, সে একটা আধটা উত্তর দেয়। চন্দনার অভিযোগের তালিকা সুদীর্ঘ। আসল কারণ কিন্তু একটাই, দাম্পত্যের মূল সম্পর্ক। একই শয্যায় দু'জনে রাত্রিবাস করে বটে, কিন্তু শরীর বিচ্ছিন্নই থাকে। অতনুর দিক থেকে কোনো সাড়া নেই।

তিন তিনবার গর্ভ নষ্ট হয়ে গেছে চন্দনার, কিন্তু সন্তান কামনায় একটা চাপা কান্না রয়ে গেছে তার বুকের মধ্যে। সেই কান্না কখনো কখনো আর্তনাদ হয়ে ওঠে।

তিনবার এরকম হবার পরেও কি আর সন্তান সম্ভাবনা থাকে! কারুর কি দোষ আছে! এক সাথে গিয়ে ডাক্তারের পরামর্শও নেয়া হয়েছে, কারুরই কোনো খুঁত নেই। এবং আবার সন্তান-সম্ভাবনা তো হতেই পারে!

তবু চন্দনার ধারণা, দোষটা অতনুর। শুধু তো জৈবিক ব্যাপার নয়। একটা ইচ্ছা শক্তি থাকা দরকার। অতনুর যে সেটাই নেই। সন্তান না হওয়াটাও যেন সাধারণ ব্যাপার। আর এখন তো শরীরও জাগে না।

একদিন চন্দনাই জিজ্ঞেস করলো, তোমার আর ইচ্ছে করে না?

অতনু বলল, হ্যাঁ, ইচ্ছে করে।

তারপর সে যা করল, তা একেবারে হাস্যকর।

সে চন্দনাকে জোরে আঁকড়ে ধরলো। তারপর সেইভাবেই নিঃস্পন্দ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

চন্দনা গায়ে একটা খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করল, এই, কী হলো?

হু-হু করে কেঁদে ফেলল অতনু।

এই কান্নায় সহানুভূতি হয় না, মায়া হয় না, রাগ হয়। বিছানা ছেড়ে উঠে গেল চন্দনা।

পরদিন থেকে সে অন্য ঘরে শোয়।

ঠিক দু'মাস পরে, এক ছুটির দিনে চা-টা খাবার পর চন্দনা বলল, শোনো, তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। আজ মাথার ঠিক আছে তো? যা যা বলব, বুঝতে পারবে?

অতনু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

চন্দনা বলল, সামনের সপ্তাহে আমি আবার জার্মানি চলে যাচ্ছি।

জার্মানি? কেন?

ওখানে আমি একটা চাকরি পেয়েছি। আমি আর এদেশে থাকব না। আমাদের কোম্পানিটা তো ডুবতে বসেছে, এটাকেও আর সামলানোর ক্ষমতা আমার নেই। আমার শেয়ারটা আমি বিক্রি করে দিতে চাই, এখনই দিচ্ছি না। পরে সেই রকমই একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি চেষ্টা করে দ্যাখো, যদি চালাতে পার।

অতনু আলতো গলায় বলল, তুমি চলে যাবে?

চন্দনা বলল, হ্যাঁ। আমার এখানে অসহ্য লাগছে। আমি হাঁপিয়ে উঠছি। তুমি বিশ্বাস করো, অতনু। আমি অ্যাডজাস্ট করার অনেক চেষ্টা করেছি। এখন বুঝেছি, তা আর সম্ভব নয়। নাউ আই অ্যাম ফেডআপ। আমাদের কনজুগাল লাইফ শেষ হয়ে গেছে।

অতনু বলল, আমি জানি না, কেন আমি একটা জলে আধডোবা জাহাজের মতন, কিছুতেই কিছু ঠিক হচ্ছে না। গুলিতেই আমার পুরোপুরি মরে যাওয়া উচিত ছিল।

চন্দনা বলল, আমি তোমাকে একটা সাজেশন দেবো, অতনু? কোম্পানি তুমি বিক্রি করে দাও, আমার শেয়ারের টাকাটা তুমি পরে দিয়ে দিও। আপাতত তুমি কোনো একটা নার্সিং হোমে গিয়ে থাকো। যতদিন না তুমি পুরোপুরি সুস্থ হও। এখানে কে তোমার যত্ন করবে?

অতনু বলল, বিক্রি? দেখি।

চন্দনা চলে যাবার পর সত্যিকারের বিপদে পড়ে গেল অতনু।

একটা লোকশানে চলা কোম্পানি বিক্রি করতে চাইলেই তো হুট করে বিক্রি হয় না। একটা অফিস ইচ্ছে করলে হঠাৎ বন্ধ করা যায় না। আরো লোকশান দিয়েও চালিয়ে যেতে হয়। এতগুলো কর্মচারীকেও বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায় না।

অতীত স্মৃতি ফিরে না এলেও বর্তমান সম্পর্কে অনেকটা সজাগ হয়ে গেল অতনু। সে সচ্ছল পরিবারের সন্তান, কখনো টাকা-পয়সার অভাব বোধ করে নি। ব্যবসাটাও এক সময় বেশ ভালোই দাঁড় করিয়েছিল। এখন প্রতিদিন অর্থ চিন্তা। পেটের ভাতে টান পড়লে পাগলামিও ঘুচে যায়।

এর মধ্যে একদিন রবি এসে উপস্থিত। আর্ত মানুষের মতন তাকে প্রায় আঁকড়ে ধরলো অতনু। তার আর বিশেষ কোনো বন্ধু নেই, যে দু'একজন ছিল, তারাও দূরে গেছে।

আহত অভিমানে অতনু জিজ্ঞেস করলো, তুই কোথায় ছিলি এতদিন? এই অবস্থায় আমাকে ফেলে চলে গেলি?

সরাসরি উত্তর না দিয়ে রবি বলল, এই ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম উত্তর ভারতে। দেশের অবস্থা বোঝার জন্য। আমার উপর দেশ চালানোর ভার নেই। তবু জানতে ইচ্ছে করে।

আসলে, রবি জানে, চন্দনা তাকে একেবারেই পছন্দ করে না। চন্দনার ধারণা, রবির প্রভাবে, রবির দেওয়া বই-টই পড়েই অতনু এমন গোঁয়ার ধরনের নাস্তিক হয়েছে। কাজের বদলে তর্কাতর্কিতেও বেশি সময় নষ্ট করে।

চন্দনার এরকম মনোভাবের জন্যই রবি দূরে সরে গেছে, তবে মোটামুটি সব খবরই সে রেখেছে।

অতনু বলল, রবি, আমি এই কোম্পানিটা চালাতে পারছি না। তুই আমাকে সাহায্য করবি না? তুই একটা কিছুর ভার নে।

রবি বলল, আমি তো ভাই কোনো দায়িত্ব নিয়ে আটকা পড়তে পারবো না। তা আমার ধাতে নেই। তবে, বাইরের বিজনেস মহলে যা শুনছি, তোর ঐ শ্যালকটি, বসন্ত, সে-ই নাকি তলায় তলায় কোম্পানিটাকে ফাঁক করে দিচ্ছে। এখন চন্দনা নেই, তুই ওকে স্যাক কর।

অতনু বলল, বসন্ত? সে ম্যানেজার। হঠাৎ এক কথায় কি তাকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়?

তাহলে প্রত্যেক দিন ওকে ডেকে কাজের ফিরিস্তি নে। ব্যাংকে ওভার ড্রাফ্‌ট দিয়েছে। তার জবাবদিহি চা। তোকে শক্ত হতে হবে অতনু। আমি একটা ব্যাপার দেখে অবাক হচ্ছি, গুলি লাগবার পর যখন তুই হাসপাতালটায় ছিলি, তখন তোর বুকে অত বড় ব্যান্ডেজ, তবু তোর কথাবার্তায় যথেষ্ট তেজ ছিল, মাঝে মাঝে খানিকটা অসংলগ্ন হলেও জোর দিয়ে, যুক্তি দিয়ে বলতি। কিন্তু কোলকাতা আসার পর থেকেই তুই কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছিস, আরো বেশি করে সব কিছু ভুলে যাচ্ছিস, এমন হচ্ছে কেন?

কী জানি। সব সময় মাথাটা অবশ অবশ লাগে।

ওষধগুলো যে খাচ্ছিস, তার জন্য হতে পারে। এই সব বেশির ভাগ ওষুধই মাথাটাকে ঝিম পাড়িয়ে রাখে। সব ওষুধ কিছুদিন বন্ধ করে দিয়ে দ্যাখ তো। সাইকো সোমাটিক প্রবলেম নিজের মনের জোরে সারতে হয়। অফিসের ব্যাপারটা খানিকটা সামলে নে, তারপর তোকে আমি একবার মহুলধারায় নিয়ে যাবো। তাতে কিছু উপকার হতে পারে। হ্যাঁ, ভালো কথা, সেখানকার বাড়িটার কথা এখন মনে পড়েছে তো?

রবি, তুই বলেছিস, চন্দনাও বলেছে, ওখানে একটা বাড়ি কেনা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস কর, সে বাড়িটার কথা বিন্দু-বিসর্গ মনে পড়ে না। আমি শুধু দেখতে পাই একটা দরজা, সেখানে তিনজন লোক, তাদের একজনের হাতে রিভলভার—

ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাড়িটা কেনা হয়েছে এই কোম্পানির নামে। অফিসের কাগজপত্রেই দেখতে পাবি। আমি এর মধ্যে মহুলডেরায় একবার গিয়েছিলাম।

কেন?

এমনিই, কৌতূহলে। বাড়িটা তালাবন্ধ পড়ে আছে। উগ্রপন্থীরা দখল নিতে পারে নি,

ওখানে পুলিশের আনাগোনা বেড়েছে। ওসমান সাহেবও বলেছেন, নজর রাখছেন। কিন্তু বাড়িটা নিয়ে এখন কী হবে? বিক্রির কোনো চান্স নেই। ওসমান সাহেবও ন্যাচারালি ফিরিয়ে নেবেন না, টাকাটা তিনি অন্য জায়গায় অলরেডি ইনভেস্ট করে ফেলেছেন। আমাকে খুব খাতির-যত্ন করলেন অবশ্য। যাই হোক, এ বাড়ির এখন কোনো রি-সেল ভ্যালু নেই। একটা মাত্র উপায় আছে, সেই কথাটাই তোকে বলতে এলাম।

কী?

ঐ অঞ্চলে সেন্ট্রাল পুলিশের একটা বড় ফাঁড়ি হবে শুনেছি। তাদের কাছে বাড়িটা ভাড়া দিতে পারিস। তাতে মাসে মাসে তোদের ভালো আয় হবে।

ঠিক তো, ঠিক তো।

ওরকম ঠিক তো, ঠিক তো বললেই হবে না। এখন সব ব্যাপারে উমেদারি করতে হয়। ওদের অফিসে গিয়ে ধরাধরি করতে হবে। যদি টেন্ডার ডাকে, দু'একখানা ফল্‌স টেন্ডার দিবি। এবং শুভস্য শীঘ্রং।

কে করবে এসব?

আশ্চর্য ব্যাপার! তোর অফিসে অতগুলো লোক থাকে কী করতে? ওদের বললেই বুঝবে।

রবি। তুই আমার পাশে এসে রোজ একটু বসবি?

না, রোজ বসবো না। মাঝে মাঝে আসতে পারি।.কিন্তু তোকে আর ম্যাদা মেরে থাকলে চলবে না। উত্তেজিত, জাগ্রত, ইয়াং ম্যান। যুদ্ধ ক্ষেত্রে গুলি খেয়েও অনেকে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকে।

এর দু'দিন পরে যে ঘটনাটা ঘটলো, সেদিন রবি আসে নি।

সেদিন অতনুর মেজাজ খুবই খারাপ।

নিজের চেম্বারেই মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে অতনু। একটু আগে বসন্ত এসে বলে গেছে, বাইরের থেকে টাকা জোগাড় করতে না পারলে এ মাসে কর্মচারীদের মাইনে দেওয়া যাবে না। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট শূন্য।

এ নিয়ে বসন্তর সঙ্গে খানিকটা রাগারাগিও হয়ে গেছে।

রাগের সময় সমস্ত অনুভূতি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে। সে ভাবছে, নিজের বসত বাড়িটাই বেঁচে দেবে।

এই সময় নিচ থেকে রিসেপশনিস্ট জানালো, একজন মহিলা তার সাথে দেখা করতে চান।

অতনুর আগের অভ্যেস ছিল, কেউ দেখা করতে চাইলে সে ফেরাতো না। তবু জিগেস করলো, আমার নাম করেই দেখা করতে চান, অথবা কোনো কাজে? যদি কাজের জন্য হয়, সেই ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দাও।

না, তিনি অতনুর সঙ্গেই দেখা করতে চান, ব্যক্তিগতভাবে।

একটু পরেই সুইং ডোর ঠেলে ঢুকলেন একজন মহিলা, সালোয়ার-কামিজ পরা, চুল খোলা, রঙ ফর্সা হলেও চোখের নিচে কালো দাগ, শরীরের গড়নও খানিকটা বেঢপ ধরনের। অতনু একে আগে কখনো দেখে নি।

অতনু মুখ তুলে তাকালো, মহিলাটি একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তারপর নিচু গলায় বলল, তুমি কেমন আছ?

প্রশ্নটা অতনুর কানে ধাক্কা দিল। তুমি?

সে নিস্পৃহ গলায় বললো, আই থিংক উই আর নট প্রপারলি ইনট্রোডিউশন। আমার নাম অতনু হালদার। আপনি?

সে বলল, চিনতে পারছ না! পোশাক অন্য রকম। আমি দীধিতি।

অতনু বলল, ডিডিটি? হোয়াট কাইন্ড আ নেইম ইজ দিস? আগে কখনো শুনি নি।

আমি এতদিন যোগাযোগ করি নি তোমার সঙ্গে, ভেবেছিলাম, তুমিই আসবে। আমি আর আশ্রমে থাকি না। শুধু তোমাকে একবার দেখতে এসেছি।

আমি তো এসব কিছুই বুঝতে পারছি না। আশ্রম? আমার সঙ্গে কোনো আশ্রমের সম্পর্ক নেই? আপনি কী চান আমার কাছে?

আমি কিছুই চাইতে আসি নি। তুমি কি আমাকে সত্যিই চিনতে পারছ না, না ইচ্ছে করে চিনতে চাইছ না।

এবার অতনু দপ করে জ্বলে উঠল। এই সময় তার ভাষার ঠিক থাকে না।

সে বলল, ইচ্ছে করে চিনতে চাইবো না মানে? বাজার থেকে যে-কোনো মেয়ে এসে আমার সঙ্গে তুমি তুমি করে কথা বললেই তাকে চিনতে হবে? আমি আজ খুবই ব্যস্ত আছি, যদি সত্যি কোনো দরকার না থাকে, প্লিজ।

না, কোনো দরকার নেই।

ভেতরে এসে একবার বসেও নি, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেল দীধিতি।

ছয়

একটা অন্ধকার ঘরের দরজা-জানালা হঠাৎ খুলে গেল, বাইরে থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশুদ্ধ আলো। অনেকটা সেই রকমই হলো অতনুর।

অবশ্য একেবারে হঠাৎ হয় নি।

অফিসের অবস্থাটা অনেকটা সামলে নেবার পর রবিই তাকে নিয়ে গেল ব্যাঙ্গালোরে। সেখানে নতুন ধরনের চিকিৎসার কথা শোনা যাচ্ছিল কিছু দিন ধরে। অ্যাসপিরিনের মতন সামান্য একটা ঔষুধকে ভিত্তি করে নতুন একটা ওষুধ বেরিয়েছে, সেই ঔষুধেই আশ্চর্য কাজ হলো অতনুর। চৌদ্দ দিনের মধ্যে সে পরিপূর্ণ স্মৃতি ফিরে পেল। ডাক্তারের সামনে সে গড়গড় করে মুখস্থ বলল টি এস এলিয়টের একটি সম্পূর্ণ কবিতা। ধাঁধার উত্তরের মতোন সে টকাটক বলে দিতে লাগলো, ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কোন দেশ সবচেয়ে শেষে আত্মসমর্পণ করে। রংধনুর সাতটা রঙ, তার বাবার মৃত্যু তারিখ, শিল্পী হুসেনের পুরো নাম। এ সেই আগেকার বুদ্ধিদীপ্ত, সপ্রতিভ অতনু।

ফেরার পথে ট্রেনে অতনু বলল, প্রথমেই যেতে হবে মহুল ডেরায়, দীধিতির সঙ্গে দেখা করতে হবে, আমি তার কাছে খুবই অপরাধী।

রবি বলল, সে তোর কাছে একবার এসেছিল, তুই তাকে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছিস।

হ্যাঁ। তাও মনে পড়েছে। কিন্তু তখন আমার মাথা তো দুর্বল ছিলই, তা ছাড়া ওর সাজ পোশাক অন্য রকম। তাছাড়া সেই রূপও ছিল না। ঠিক চিনতে পারি নি।

খুব বেশি মানসিক যন্ত্রণা হলে রূপের উপর তো তা ছায়া পড়বেই।

কিন্তু অত তাড়াতাড়ি, মাত্র কয়েকমাসে তার ফিগারটাও নষ্ট হয়ে যাবে?

তোর কাছে যখন সে এসেছিল, তখন সে সাত মাসের প্রেগন্যান্ট। সেই সময় কোনো মেয়ের ফিগার ঠিক থাকে?

প্রেগন্যান্ট? যাহ্‌, তুই কী বলছিস! তুই কী করে জানলি?

আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তোর সঙ্গে যেদিন দেখা করতে আসে, সেদিন আমাকে জানালে আমি উপস্থিত থাকতে পারতাম। তা হলে হয়তো ব্যাপারটা অন্য রকম হতো।

জানায় নি কেন?

বোধহয় ও আমার সাহায্য নিতে চায় নি। আমি তোর অসুস্থতার কথা ওকে জানিয়েছি আগে। ও ঠিক বিশ্বাস করে নি। ও নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিল। তোকে দেখে তো কিছু বোঝা যেত না।

অতনু বিহ্বল ভাবে বলল, প্রেগন্যান্ট? কী করে হলো?

রবি বলল, সেটা তুই-ই ভালো জানিস!

অতনু জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না।

রবি বলল, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই নেই। এটা একটা বাস্তব ঘটনা। ওর একটি মেয়ে হয়েছে।

অতনু কিছুক্ষণ তাকিয়েই রইল বাইরে। এখানকার প্রকৃতি বাংলার মতন সজল নয়। রুক্ষ, পাহাড়ি।

এটা একটা ফার্স্ট ক্লাস কুপ, শুধু দু'জনের জন্য। দরজা বন্ধ করে এখানে মদ্য পানে কোনো বাধা নেই। রবি সব ব্যবস্থা করে এনেছে।

দু'টি গেলাসে ঢালার পর রবি বলল, নে। তুই এখন চন্দনার সঙ্গেও মিটিয়ে নিতে পারিস। ওর ফাঁকে ক্ষমা-টমা চেয়ে নে। কিছুদিন জার্মানিতে ঘুরেও আসতে পারিস।

অতনু শিশুর মতন সরলভাবে জিজ্ঞেস করলো, চন্দনার কাছে আমি কী অপরাধ করেছি?

কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। স্বামী-স্ত্রীর ভেতরকার ব্যাপার তো, বাইরের লোক সব জানতে পারে না।

আমাকে অসুস্থ জেনেও চন্দনা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমার অসুস্থতাটাই ও সহ্য করতে পারছিল না। রোগের জন্য কী রোগীরা দোষী হয়?

তোর রোগটা ছিল বড় পিকুলিয়ার ধরনের। বাইরের থেকে বোঝা শক্ত ছিল। দীধিতিও এই ধারণা নিয়ে গেছে যে, তুই তাকে ইচ্ছে করে চিনতে চাস নি।

চন্দনার কাছে ক্ষমা চাইবার কিছু নেই। কিন্তু দীধিতির কাছে... আমার কোনো খারাপ মতলব ছিল না, ব্যাপারটা হয়ে গেল, আমি আগে থেকে কিছু ভাবি নি, কিন্তু, কিন্তু, ওর বাচ্চাটা বেঁচে আছে?

হ্যাঁ। বেঁচে আছে। আমি যতদূর জানি

আশ্রমে ওর নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হয়েছে?

ও তো আর ঐ আশ্রমে নেই।

নেই? কোথা গেছে?

আশ্রম কন্যা হয়ে একটি অবৈধ সন্তানের মা হয়েও কি আর সেখানে থাকা যায়? কখনো কখনো এরকম ঘটনা ঘটে বটে। তখন গোপনে গোপনে বাচ্চাটাকে নষ্ট করে ফেলতে হয়।

অতনু চিৎকার করে বলে উঠল, না!

সে এখন ক্রুদ্ধভাবে রবির দিকে চেয়ে রইল, যেন এসব কথা উচ্চারণ করার জন্য সে রবিকেই শাস্তি দেবে।

খানিকবাদে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে সে শান্তভাবে বলল, ঐ আশ্রমে নেই, তাহলে কোথায় থাকে এখন?

জানি না।

জানিস না? তুই জানিস না? কেন জানিস না?

কী মুশকিল, তোর অফিস থেকে ফিরে সে তো আর আমার সঙ্গে দেখা করে নি। শুধু ফোন করেছিল। কোনো অভিযোগ করে নি, কিছু না। শুধু বলেছিল, আপনারা ভালো থাকবেন। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করারও সুযোগ দেয় নি।

তবু কোলকাতায় ফেরার এক সপ্তাহ পরেই দুই বন্ধুতে গেল মহুল ডেরায়। সেখানকার আশ্রমে গিয়েও দেখা করল পুরনো পরিচিতদের সঙ্গে।

প্রায় ছ'মাস আগে দীধিতি কোনো রকম কারণ না জানিয়েই এই আশ্রম ছেড়ে চলে গেছে। খুব সম্ভবত ফিরে গেছে সংসার ধর্মে। এরকম তো কেউ কেউ যায়। একটা ঝোঁকের মাথায় বাড়ি ছেড়ে এসে আশ্রমে যোগ দিয়ে কঠোর আত্ম-নিগ্রহের জীবন গ্রহণ করে। বেশিদিন সহ্য করতে পারে না,

বিশেষত শিক্ষিত মেয়েদেরই এটা বেশি হয়।

দীধিতির বাড়ির ঠিকানা কেউ বলতে চায় না। তা জানাবার নিয়ম নেই। অনেক অনুরোধ করার পর অনুপমা নামে একজন সেবিকা আভাস দিল, দীধিতি জামসেদপুরের মেয়ে, ওর পদবি চক্রবর্তী। বাবা-মায়ের তুমুল ঝগড়া, মায়ের প্রতি বাবার অত্যাচার দেখেই ও বাড়ি ছেড়েছিল।

অনুপমা বলল, এই জায়গাটা ওর খুব ভালো লেগেছিল, আশ্রমের কাজ, হাসপাতালের কাজ করতো মন-প্রাণ দিয়ে, বাইরে যেতেই চাইত না। তবু চলে গেল। যাবার কয়েকদিন আগেও খুব কেঁদেছিল। সারাক্ষণ কাঁদত।

অনুপমা হয়তো আরো কিছু জানে। সে অতনুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, আমার বন্ধুটা খুব ভালো মেয়ে। খুব খাঁটি মেয়ে, খুব ইমোশানাল!

জামসেদপুরে প্রচুর বাঙালি। তাদের মধ্যে একটি চক্রবর্তী দম্পতি খুঁজে বার করা সহজ নয়। চক্রবর্তীও কম নয়। তবু সেখানে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে একটি চক্রবর্তী পরিবারের সন্ধান পাওয়া গেল, দীধিতির মতন একটি রূপসী মেয়ের কথা অনেকে মনে রেখেছে। তার মা আত্মহত্যা করেছেন।

বলাই বাহুল্য, দীধিতি সেখানে ফিরে আসে নি। তার সন্ধান কেউ জানে না।

তার ডাক নাম পরী। সে যেন পরীদেরই মতন অদৃশ্য হয়ে গেছে। এত বড় দেশে কোথায় পাওয়া যাবে তাকে? খড়ের মধ্যে আলপিন খোঁজাও এর চেয়ে সহজ।

অসুখ থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠার পরেও লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল তার জীবন।

চন্দনার সঙ্গে সম্পর্ক জোড়া লাগার আর কোনো সম্ভাবনাই রইল না।

তিন তিনবারেও সে চন্দনাকে মা হবার সুযোগ দিতে পারে নি। আর মাত্র একদিনের মিলনেই অন্য একটি নারী তার সন্তানের জননী হয়ে রয়েছে কোথাও। তাকে ভুলে গিয়েও সে চন্দনার কাছে ফিরে যাবে, এমন বিবেকহীন মানুষ তো সে নয়। দীধিতির দেখা না পেলেও তার স্মৃতি উজ্জ্বল হচ্ছে দিন দিন।

চন্দনা মনে করেছিল, তার পিতৃত্বের ক্ষমতাই নেই। অসুখের সময় সে অতনুকে ছেড়ে চলে গেছে। অতনু জানিয়ে দিল, চন্দনাকে বিবাহ-বিচ্ছেদ দিতে তার আপত্তি নেই। সে চন্দনার অযোগ্য।

ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসাটা সে শেষ পর্যন্ত বিক্রি করেই দিল। চন্দনার অংশের টাকা জমা রেখে ছিল ব্যাংকে। পিসতুতো ভাইটি এর মধ্যে একটি চাকরি করে বিয়েও করে ফেলেছে। এ বাড়িতেই ভাড়া থাকে। তাদেরই সংসারে যেন অতনু অতিথি। তবে দোতলাটা তার নিজস্ব।

এর মধ্যে এক বছর কেটে গেছে, তবু আশা ছাড়ে নি রবি। সে এখনো দীধিতির খোঁজ করে চলেছে। বিচিত্র তার মনস্তত্ত্ব, সে নিজের জন্য কোনো নারীকে খোঁজে না। কোনো নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় না। তবু বন্ধুর জীবনে বিশেষ এক নারীকে সে হারাতে দিতে চায় না। সে জন্য সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে।

কিংবা সে হয়তো দীধিতির জীবনটাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তার বন্ধুটি নাস্তিক, সিনিক হতে পারে, নারী-পুরুষের মুক্ত সম্পর্কে বিশ্বাসী। কিন্তু লম্পট তো সে নয়। একটি মেয়েকে ভুলিয়ে ভালিয়ে গর্ভবতী করে সে পালিয়ে যাবে, এমন মানুষ নয় অতনু। দীধিতির কাছে এটা প্রকাশ করা যেন বিশেষ প্রয়োজনীয়।

রবি ধরে নিয়েছে, দীধিতি আত্মহত্যা করতে পারে না। এরকম অপমানজনক অবস্থায় পড়লে কোনো কোনো মেয়ে আত্মহত্যা করে ফেলে ঠিকই, কিন্তু যে সদ্য জননী হয়েছে, সে তার সন্তানের জন্য সব রকম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারে।

বেঁচে থাকলে দীধিতি জীবিকার জন্য একটা কিছু কাজ নেবে নিশ্চয়ই। আর কোনো আশ্রমে যোগ দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে লেখাপড়া জানে, খানিকটা নার্সিং-এর ট্রেনিং নিলেও পুরোপুরি নার্স নয়, হাসপাতালে ভালো কাজ পাবে না। খুব সম্ভবত সে কোনো বড় শহরেও থাকতে চাইবে না।

এইসব মেয়েদের পক্ষে কোনো স্কুলে কাজ নেওয়াই স্বাভাবিক। তাও রবি ভেবে দেখলো, কোনো সাধারণ স্কুলে সে বোধহয় যাবে না। তার সঙ্গে রয়েছে একটি পিতৃ পরিচয়হীন সন্তান। অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা তার ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি-ঝুঁকি করবে। কন্যা সন্তানটির পিতৃ পরিচয় নিয়ে ঝুরি ঝুরি মিথ্যে কথা বলতে পারবে দীধিতি? মিথ্যে কথা ওর মুখে মানায় না।

একমাত্র ক্রিশ্চান মিশনারির স্কুলগুলোতেই এই সমস্যা কম। বিদেশে কুমারী মা অনেক হয়। ওরা মেনে নেয়।

রবির দৃঢ় ধারণা হলো, কোনো ক্রিশ্চান মিশনারি স্কুল কিংবা অনাথ আশ্রমেই কাজ নিয়েছে দীধিতি।

কিন্তু তাতেও তো কিছু সুরাহা হয় না।

সারা দেশে এরকম হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। ক্রিশ্চানদের মধ্যেও কত রকম ডিনোমিনেশান। একে অপরের থেকে দূরত্ব রক্ষা করে।

রবি থাকে তার দাদাদের সংসারে। অবশ্য বাড়িতে থাকে খুব কম, সারা বছরই টো টো করে বেড়ায়। মস্ত বড় পৈতৃক বাড়ি, অনেকগুলো দোকানঘর ভাড়া আছে। রবি তার একটা অংশ পায়। সেই টাকা সে উড়িয়ে দেয় ভ্রমণে।

মাঝে মাঝে সে আসে অতনুর কাছে। অতনু এখন আর তার সঙ্গে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে উৎসাহী নয়। সে আজকাল বইপত্রের মধ্যেই ডুবে থাকে। সে লেখক নয়, এত জ্ঞান সে কোন কাজে লাগাবে? সে পড়াশোনা করে নিজের আনন্দের জন্য।

এর মধ্যে বাংলা ও বিহারের সমস্ত ক্রিশ্চান মিশনারি স্কুল ঘুরে দেখে এসেছে রবি। এবার তার ধারণা হয়েছে, কেউ যাতে খুঁজে না পায়, তাই দীধিতি নিশ্চিত চলে গেছে অনেক দূরে। কন্যা কুমারী থেকে কাশ্মীর, কয়েক হাজার মাইলের ব্যবধান। কোথায় থাকে সে?

তবু শেষ পর্যন্ত রবির উদ্যম সার্থক হলো।

দীধিতিকে শেষ পর্যন্ত সে দেখতে পেল হিমাচল প্রদেশের মানালিতে।

কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নানারকম হিংসাত্মক আক্রমণের জন্য এখন অনেক ভ্রমণকারীই সেখানে যেতে ভয় পায়। কাশ্মীরের বদলে প্রায় অনুরূপ আর একটা জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া গেছে মানালি, প্রায় একই রকম, হিমালয় পাহাড়ের সৌন্দর্য, তুষারপাত, সাধারণ মানুষের আতিথেয়তাবোধ, তাই এখানে কয়েক বছরের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি পাঁচতারা হোটেল, তৈরি হয়েছে রাস্তা, সেই সঙ্গে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল।

রবির ধারণাই ঠিক প্রমাণিত হয়েছে, অনাথ শিশুদের জন্য ক্রিশ্চান মিশনারিদের একটা স্কুলের সঙ্গে যুক্ত আছে দীধিতি।

রবি তাকে আবিষ্কার করলেও দেখা দেয় নি।

যদি দীধিতি তাকে দেখলেই আবার সেখান থেকে উধাও হয়ে যায়! তাছাড়া, রবি তো একা তার সঙ্গে দেখা করে কোনো কথাও বলতে পারবে না।

কোলকাতায় ফিরে এসে সে অতনুকে প্রথমে কিছু বলল না। সে দিল্লির প্লেনের টিকিট নিজেই এনেছে, সে অতনুকে জানায় দিল্লি নিয়ে যাবেই।

অতনু প্রথমে রাজি হলো না। বাড়ি থেকে না বেরুনোটাই তার অভ্যেস হয়ে গেছে। আলস্যের একটা নেশা আছে। দীধিতির সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না ধরেই নিয়ে সে এখন ওর সম্পর্কে কল্পনা করেই মশগুল হয়ে থাকে। প্রেমিক-প্রবর অতনু এখন আর কোনো নারী সম্পর্কেও আগ্রহী নয়। আর, আশ্চর্যের ব্যাপার, সে এখন আর মদ্যপান করে না।

রবির পীড়াপীড়িতে তাকে দিল্লি যেতেই হলো। এখানে কী আছে? কিছু নেই। এখান থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে যেতে হবে পাহাড় প্রদেশে। প্রায় দশ ঘণ্টার যাত্রা। হরিয়ানা, পাঞ্জাব ছাড়িয়ে পাহাড়ের রাস্তাই অর্ধেকটা।

অতনু জিজ্ঞেস করল, আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস বল তো?

রবি বলল, তোর মেয়ের মুখ দেখবি। ইচ্ছে করে না?

মাণ্ডি থেকে কুলু। তারপর মানালি। এমনই পথের দৃশ্য যে সমতলের মানুষরা মুগ্ধ, বিভোর হতে বাধ্য। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে বিপাশা নদী। শত পৌরাণিক কাহিনী এর সঙ্গে জড়িত, নাম শুনলেই রোমাঞ্চ হয়।

স্কুলটি খুবই ফাঁকা ও নিরিবিলি জায়গায়। চর্তুদিকে পাহাড়। শীতকালে এখানে খুব বরফ পড়ে, তবু গাছপালাও প্রচুর। একটা সাদা রঙের বাংলোর সামনে অনেকখানি সবুজ প্রান্তর।

বারান্দায় একটা রকিং চেয়ারে বসে আছে দীধিতি। হালকা নীল রঙের শাড়ি পরে, একটা ঘি রঙের শাল গায়ে জড়ানো। সে উল বুনছে। আর সদ্য হাঁটতে শেখা একটি মেয়ে খেলা করছে তিনটে কুকুরের সঙ্গে। শীতের দেশের ঘন লোমভর্তি বাচ্চা কুকুর, দেখতে খেলনার পুতুলের মতন।

গাড়ি থেকে নেমে, খানিকটা বাগান বেরিয়ে দু'জন পুরুষ এসে দাঁড়ালো দীধিতির সামনে।

নিশ্চয়ই দূর থেকে ওদের আসতে দেখেছে দীধিতি, তবু ওরা কাছে এলেও সে কিছুক্ষণ উল বুনল, তারপর গলা তুলল, লছমি বাচ্চিকো ভিতর লে যানা।

একজন আয়া জাতীয় স্ত্রীলোক এসে খুকিটিকে নিয়ে গেল ভেতরে। সে আপত্তি করলো না। কুকুর তিনটেও লাফাতে লাফাতে গেল ওদের সঙ্গে।

দীধিতি বলল, আপনারা বসুন।

অতনু বলল, চিনতে পেরেছো?

দীধিতি মৃদু হেসে বলল, এ আবার কী কথা? আমার তো মানসিক অসুখ নেই, চিনতে পারব না কেন?

অনেকটা রূপ ফিরে এসেছে দীধিতির। শরীরের গড়নেও চমৎকার সৌষ্ঠব। তবে মুখের মধ্যে একবারে অকৃত্রিম সরল ভাবটা নেই, অনেক কিছুর ছাপ পড়েছে। এসেছে ব্যক্তিত্বের জোর।

একটুক্ষণ তিনজনই নিঃশব্দ।

ঠিক কী বলবে, ভেবে না পেয়ে অতনু বলল, মেয়েটাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিলে? ওকে একটু দেখতে পারি না?

দু'দিকে মাথা নেড়ে, হাসিমুখে দীধিতি বলল, না। আমি বাইরের লোকদের সামনে ওকে আনি না।

পাংশু মুখে অতনু বলল, বাইরের লোক! পরী, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি!

খুব স্বাভাবিক কৌতূহলে দীধিতি বলল, ক্ষমা, কিসের জন্য!

অতনু বলল, সব কিছুর জন্য। পরী, আমি যা কিছু করেছি, সব তো সজ্ঞানে নয়, আমার মাথার ঠিক ছিল না, বিশ্বাস করো। আমি কি আমার মেয়ের মুখটা দেখতে পারবো না!

দীধিতি বলল, আপনার মেয়ে? এ আপনি কী বলছেন! ছিঃ, এসব কথা বলতে নেই। ও একটা বাজারের মেয়ের সন্তান। ওর বাবার ঠিক নেই।

এগিয়ে এসে, দীধিতির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে অতনু একেবারে নিঃস্ব মানুষের মতন বলল, এরকম কথা যখন আমি বলেছি, তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না, বিশ্বাস কর, তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে, আমি মিথ্যে কথা বলছি না, সে জন্য আমি ক্ষমা পেতে পারি না?

দীধিতি বলল, ক্ষমার কথা বলছেন কেন, আপনি তো ঠিকই বলেছেন! সন্তানের বাবা কে, তা কে ঠিকঠাক বলতে পারে? বাবারাই বললেই কি ঠিক নয়? অন্য যে-কেউ তো হতেই পারে, তাই না? মায়েরাই শুধু জানে। আমি জানি, ও বাজারের মেয়ে।

তুমি এটা রাগের কথা বলছ। আমি তোমাকে ভুলতে চাই নি। আমি তোমাকে এই কথাটি জানাতে এসেছি তোমাকে পেয়ে সেই রাতে আমি যে যে মাধুর্য পেয়েছি, তা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। কী করে যেন সেটা হয়ে গিয়েছিল। তোমাকে ছাড়া, পৃথিবীর আর কোনো মেয়েকে ভালোবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

দীধিতি একটু ঝুঁকে, অতনুর চুলে হাত দিয়ে খুব কোমলভাবে বলল, অতনু, আমার সেই অভিজ্ঞতাও কোনো দিন ভুলব না। কিন্তু তারপর আমি ভালো শিক্ষাও নিয়েছি। পুরুষরা ইচ্ছে করলে ভালোবাসা দেখাবে, ইচ্ছে করলে ভুলে যাবে। দূরে সরে যাবে। তা তো আমরাও করতে পারি, তাই না? মেয়েরা সন্তান চায়, আমি চেয়েছি। এখন আমার ইচ্ছে করলে, যদি প্রয়োজন হয়, যদি শরীর তেমন জাগে, তখন তো আমি যে-কোনো পুরুষকেই ডাকতে পারি! কোনো পুরুষের সঙ্গে পাকাপাকি সম্পর্কে আমি বিশ্বাস করি না। আমি স্বাধীন থাকতে চাই।

অতনু বলল, পরী, তুমি অবশ্যই স্বাধীন থাকতে পার। কিন্তু আমার আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। আমি তোমার কাছে থাকতে চাই।

দীধিতি বলল, না, তা সম্ভব নয়। ও বোধহয় তা পছন্দ করবে না।!

দীধিতি আঙুল দিয়ে একদিকে দেখাল। এক গাদা কাঠের বোঝা কাঁধে নিয়ে বাগান পেরিয়ে আসছে একজন পাহাড়ি মানুষ।

দীধিতি বলল, ওর নাম প্রীতম সিং। আপাতত প্রীতমই রাত্তিরে আমার শয্যা সঙ্গী। একসেলেন্ট পার্টনার। আমি অবশ্য ওর কাছ থেকে সন্তান চাই না, এখন শিখে গেছি, কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার করি। ও কিন্তু আপনাদের পছন্দ করবে না। আপনারা বরং এবার উঠে পড়ুন।

তারপর রবির দিকে তাকিয়ে সে বলল, আপনি তো এ পর্যন্ত একটাও কথা বলেন নি। তাতেই আমি সব বুঝেছি, আপনি আপনার বন্ধুকে এবার নিয়ে যান।

কাঁধে বোঝা নিয়ে পাহাড়ি মানুষটি প্রায় কাছে এসে পড়েছে। রবি আর অতনু উঠে পড়ল।

গাড়ির কাছে এসে অতনু বলল, রবি, তুই কিছু বললি না কেন রে? তুই আমাকে একটুও সাহায্য করলি না!

রবি বলল, আমি দেখলাম, শেষ পর্যন্ত মিলল না!

অতনু বলল, কী মিলল না?

রবি বলল, তোর মনে আছে, প্রথম দিন ঐ মেয়েটিকে দেখে বলেছিলাম ওর নাম শকুন্তলা?

হ্যাঁ, মনে আছে। তুই কালিদাসের নাটকের সঙ্গে তুলনা দিচ্ছিলি, তাই না?

আমার আশা ছিল, শকুন্তলার সঙ্গে অনেক দিন পর দেখা হলে হয়তো ঐ নাটকের মতনই কিছু হবে। কিন্তু দীধিতি শেষ কালে যা বলল, তা কালিদাসের বাবাও কল্পনা করতে পারত না। ইচ্ছে মতন যে-কোনো পুরুষের সঙ্গে রাত কাটানো? বাপরে বাপ! আমার পক্ষেও হজম করা শক্ত!

অতনু একটা লম্বা নিঃশ্বাস টেনে বলল, সে যুগ, আর এ যুগ! কিন্তু দীধিতি কি সত্যি কথা বলছিল? ঐ লোকটির সঙ্গে...

রবি বলল, তা আমি জানি না। কিন্তু ও যে আমাদের তাড়াতে ব্যস্ত ছিল, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

অতনু বলল, এতদিন আমি ওর স্মৃতি নিয়ে ছিলাম। এখন কী কী করব, বল তো? কী নিয়ে বাঁচব?

রবি হাসতে হাসতে বলল, খুঁজে দেখ! তবে, তোর মতন নাস্তিকদের নিয়তি হচ্ছে একাকিত্ব! নাস্তিকরা কাউকেই আঁকড়ে ধরতে পারে না। তারা নিজেকেই খুঁজে বেড়ায়! ■